বীরভূমের ইতিহাস।

---:০:০:---

প্রথম খণ্ড।

প্রথম সংস্করণ।

শ্রীযুক্ত প্রতাপ নারায়ণ রায় মহাশয়
প্রণীত।

দুবরাজপুর—১৯১১ সাল।

বীরভূম-বার্ত্তাপ্রেসে শ্রীধ্বজাধারী সাহা কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ॥• আট আনা মাত্র।

বীরভূম ইতিহাস

প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ড।

যন্ত্রস্থ।

পরিশিষ্ট।

বীরভূমের ইতিহাস।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম সংস্করণ।

শ্রীযুক্ত প্রতাপ নারায়ণ রায় মহাশয়
প্রণীত।

দুবরাজপুর—১৯১১ সাল।

বীরভূম-বার্ত্তাপ্রেসে শ্রীধ্বজাধারী সাহা কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
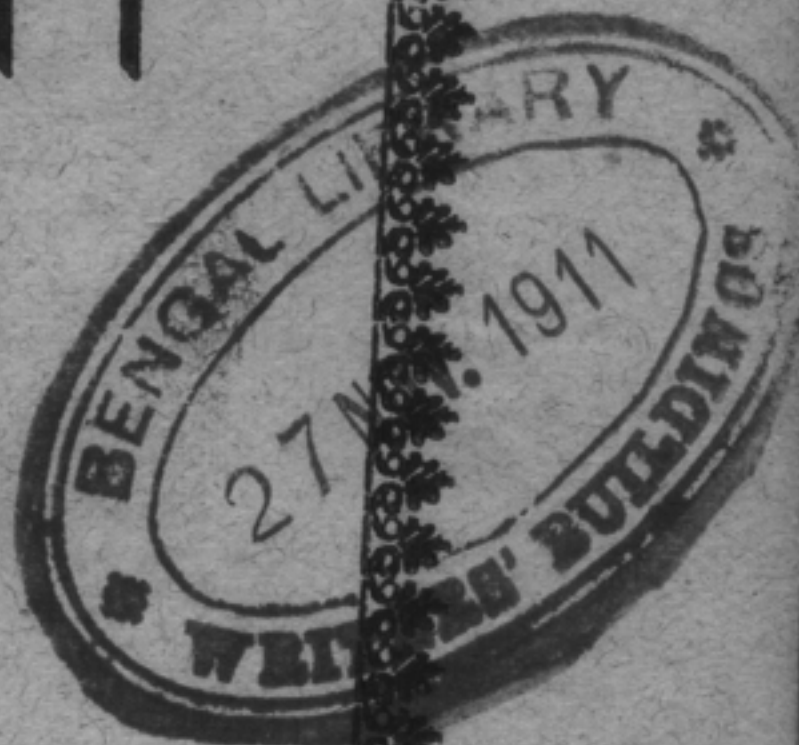
মূল্য ॥• আট আনা মাত্র।

বীরভূম ইতিহাস

প্রথম খণ্ড।

১। পীঠ স্থান সমূহের বর্ণনা।

২। মহাত্মা ও সাধকগণের জীবনী।

৩। সাধারণ প্রাচীন জমিদার ও উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীগণের বংশাবলীর বিবরণ।

৪। বর্ত্তমান পীঠের সাধক, তত্ত্বাবধানকারী ও সংস্কারকগণের বিবরণ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

যন্ত্রস্থ।

১। বীরভূমস্থ রাজগণের নাম অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান রাজ গণের কীর্ত্তি কাহিনী।

পরিশিষ্ট।

১। সাঁওতাল বিদ্রোহ।

২। বীরভূমের উৎসবাদি ও মেলার বিবরণ।

৩। বীরভূমবাসীদিগের প্রকৃতি ও শিক্ষা।

৪। বীরভূমের থানা, চৌকী ও স্কুল, কলেজ।

৫। বীরভূমের সংবাদ পত্রাদি।

৬। বীরভূমান্তর্গত দুবরাজপুরের পাহাড় ও নদীর বিবরণ।

৭। রাজ ভক্তি।

উৎসর্গ।

পরম সুহৃদবর

শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সিংহ

ব্যারিষ্টার মহোদয়ের কর-সরোজেষু।

আপনার সততা, সরলতা ও সত্যবাদিতা গুণে বিমুগ্ধ হইয়া মৎ প্রণীত বীরভূম ইতিহাস আপনাকে বীরভূমের সমুজ্জ্বল রত্ন বিবেচনা করিয়া আপনারই কর-কমলে সাদরে অর্পণ করিলাম।

অভিন্ন হৃদয়

শ্রীপ্রতাপ নারায়ণ রায় মহাশয়।

ভূমিকা।

বোধ হয় পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে বীরাচারি অর্থাৎ শক্তি সাধক ও অনেক কপালিকের বাসস্থান ছিল ও মহাবীর রাজা বীরসিংহের অধিকৃত স্থান বলিয়া পশ্চিম বঙ্গের সীমান্ত প্রদেশেরি নাম বীরভূম হয়। বীরভূম পুরাকাল হইতে মহাপ্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া ভারতে বিখ্যাত এবং অনেক কালী মন্দির ও শিবমন্দির প্রভৃতি অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে মন্দিরের মধ্যে অনেকই প্রাচীন ও ধ্বংসাবশিষ্ট পরিদৃষ্ট হয়।

অতীত কালে বহুসংখ্যক মহাত্মা এই বীরভূমে বাস করিতেন, যথা রাজা বীরসিংহ, রুদ্রচরণ রায় ও কৃষ্ণদেব রায় প্রভৃতি হিন্দুবীর যোদ্ধাগণ, কালুবীর, আলিলকি খাঁ প্রভৃতি অন্য যোদ্ধাগণ ও বিভাণ্ডক, মেধস, ঋষ্যশৃঙ্গ, বশিষ্ঠ, কনাদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ ও বৈদ্যনাথ প্রতিষ্ঠাতা বৈজভেল, বিরূপাক্ষ, ঘনশ্যাম গোস্বামী. জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, নিত্যানন্দ, পর্ণগোপাল, সাহেবতুল্লা প্রভৃতি ক্ষণজন্মা সিদ্ধপুরুষগণ ও মহারাজ নন্দকুমার ও রামজীবন প্রভৃতি কীর্ত্তিমান মহাত্মাগণ একদা বীরভূমের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

বলিতে কি এই সকল মহাত্মাগণ মধ্যে অনেকেই এই বীরভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া জননী জন্মভূমি বীরভূমির মহিমা দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া বীরভূমিকে সমগ্র ভারতভূমির অগ্রণী করিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষগণের অদম্য শক্তি সুদর্শনে একদা সমগ্র জগৎবাসী পূণ্য প্রসূ বীরভূমির ভূয়সী প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

সেই পূণ্যভূমি পরম পবিত্র বীরভূমি ইদানীং বিগ্রহশূন্য দেবালয়ের ন্যায় শ্রীশূন্য ; ইহা কি পরিতাপের বিষয় নয় ? অতীতের বিস্মৃতি ভূগর্ভ নিহিত বীরভূমের লুপ্ত রত্নোদ্ধারে বদ্ধপরিকর হইয়া প্রাগুক্ত মহাত্মাগণের জীবনীসম্বলিত বীরভূমের সত্যভূত, বর্ত্তমান বিবরণাঙ্কিত সমগ্র বীরভূমির ইতিবৃত্ত, বীরভূম ইতিহাসে প্রকাশ করিলাম।

কারণ বহু আয়াসে ও যত্নে ও নানা স্থান অনুসন্ধানে ও অন্যান্য সুধীগণের কতক কতক জীবন বৃত্তান্ত অনুসন্ধানে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি তৎসমুদয় অতি সামান্য ও প্রবাদ বাক্য ইত্যাদি শুনিয়া বীরভূমস্থ মহাত্মাগণের বিস্তৃত জীবনী প্রকাশ করিলাম।

দুঃখের বিষয় এই যে পূর্ব্বে বীরভূমস্থ মহাত্মা পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তি যাঁহারা এই বীরভূমের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই অবশ্যই সেই অতীত সময়ের বৃত্তান্ত সমূহ ঐতিহাসিক ভাবে পুস্তকাকারে যদি লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে তদবলম্বনে আজ অনায়াসে একটী জগদ্বিখ্যাত বীরভূমের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিতে আমার ক্লেশ ও বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না। প্রাচীন প্রকৃত বিবরণ প্রচুর ভাবে না পাওয়া হেতু আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে এই বীরভূম ইতিহাস প্রকাশিত করিলাম

মুর্শিদাবাদ,
ভাহাপাড়া রাজবাটী,
পোঃ দুবরাজপুর,
বীরভূম।

নিবেদক—

শ্রীপ্রতাপ নারায়ণ রায়।

বীরভূম প্রাচীন ইতিহাস।

প্রথম খণ্ড।
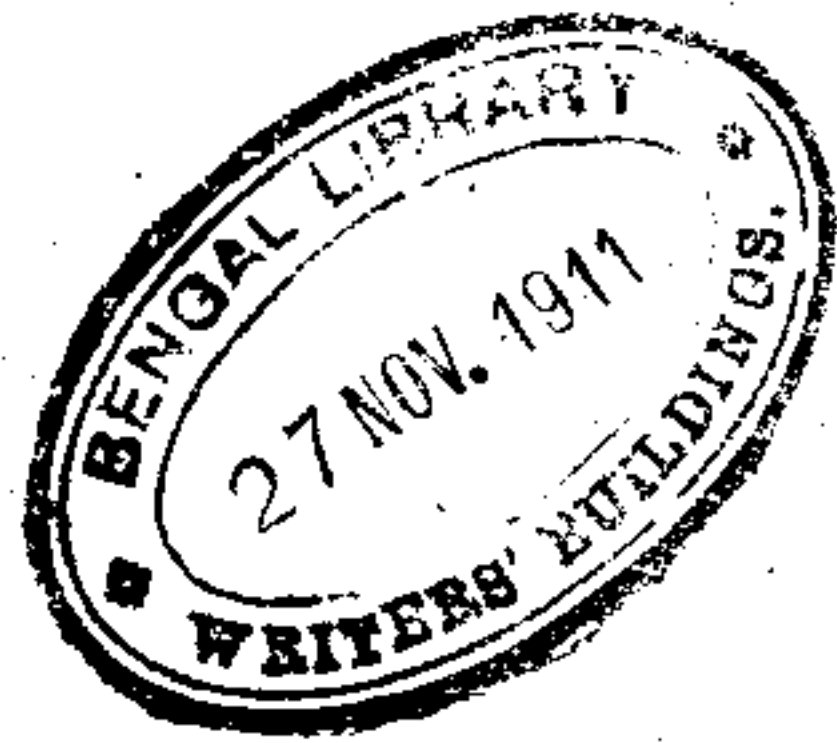
বীরভূমের পীঠস্থান।

অনাদিলিঙ্গ তারাপুর, চণ্ডীপুর মহাশ্মশান স্থল—মন্দিরে মহাদেবী তারা মা। এই স্থানে মহর্ষি বশিষ্ঠ তিন লক্ষ মন্ত্র জপে সিদ্ধ হন। বীরভূমের অন্তর্গত মল্লারপুর ষ্টেশনের আনুমানিক ৫ মাইল দক্ষিণে দ্বারকানদী তীরে এই পরম পবিত্র স্থল দৃষ্ট হয়। নাটোরাধিপতি মহারাজ সাধক রামকৃষ্ণের প্রদত্ত ব্যয়ে মায়ের নিত্য নৈমিত্তিক সেবাদি সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। ললাটেশ্বরী বীরভূমের অন্তর্গত নলহাটী গ্রামের ষ্টেশনের এক মাইল দূরে পার্ব্বতীতলা। অত্র স্থলে মহাদেবী দুর্গার ললাট পতিত হইয়াছিল বলিয়া দেবীর নাম ললাটেশ্বরী। সাধকগণ সপ্তাহ কাল এই স্থলে জপ করিলে সিদ্ধ হন।

মহারাজ দেবী সিংহের বংশধর রাজা উদন্ত সিংহ মায়ের সম্বন্ধে কতক গুলি সম্পত্তি প্রদান করেন। এক্ষণে উক্ত রাজ বংশধর পোষ্যপুত্র মহারাজ রণজিত সিংহ বাহাদুর নশীপুরের অধীশ্বর, ইনি সেবাদি যথানিয়মে সুনির্ব্বাহের বিশেষ নিয়ম ও বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন এবং সময় সময় অতিথি সেবাদি পূর্ব্ববৎ হইতেছে কি না তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন। সেই জন্যই উক্ত সেবা নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

বীরভূমের অন্তর্গত সাঁইতা নামক গ্রামের প্রান্তে নন্দিকেশ্বরী মহাপীঠ। সাধক পাঁচ লক্ষ মন্ত্র জপে সিদ্ধ লাভ করিয়া থাকেন। সাঁইতা ষ্টেশনের নিকটই ঐ মন্দির দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আমোদপুর ষ্টেশনের ছয় মাইল ব্যবধানে পূর্ব্বদিকে লাভপুর গ্রামের সন্নিহিত ফুল্লরা একটী মহাপীঠ। এই পীঠ স্থলে রূপা ও স্বরূপা নামে দুইটী শিবা আছে। দেবীর ভোগাদির পূর্ব্বে শিবাভোগ হইয়া থাকে এখনও পর্য্যন্ত সেই শিবা নয়ন গোচর হয়।

কেউ গ্রামে বেল্লেশ্বরী। নান্নুরে বিশালাক্ষী অর্থাৎ বাশুলী দেবী। এই স্থানে মহাকবি চণ্ডিদাস সিদ্ধি লাভ করেন। কীর্ণাহারে ভদ্রকালী মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। ক্ষীর গ্রামে * যোগাদ্যা মায়ের মন্দির আজও মা বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং তাঁহার সেবা পূজার জন্য মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত ভাহাপাড়ার রাজবংশধর মধ্যে মহা-রাজ দর্পনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী মহাশয় মা যোগাদ্যার সেবা কল্পে নন্দনপুর মহাল নামক একটী মহাল যাহার আয় বার্ষিক আড়াই সহস্র টাকা তন্মধ্যে তাঁহার ইষ্টদেব মানকরের ভট্টাচার্য্য বংশীয় শিবনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রণামী বাবত নয় শত টাকা বাদে বক্রী ষোল শত টাকা বার্ষিক উক্ত মায়ের সেবার জন্য অর্পণ করিয়া ইষ্টদেবকে এক্‌জিকিউটার নিযুক্ত করিয়া যান; এবং মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতিও অনেক সম্পত্তি উক্ত মায়ের সেবার জন্য প্রদান করিয়া ছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত সে স্থানে বৈশাখ মাসে সংক্রান্তি দিনে মহামেলা হইয়া থাকে।

বোলপুরের নিকট বাগাই চণ্ডি। সুপুরে সুরক্ষ চণ্ডি, বকুল কালীতলা, বগলা, দক্ষিণাকালী, কঙ্কালীতলা এই গুলি মহাপীঠ।

বোলপুর ষ্টেশনের প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বকোণে আদিতাপুর গ্রামের পূর্ব্ব দিকে কুপাই নদীর তীরে পরম পবিত্র স্থান।

দ্বারবাসিনী দ্বারকেশ্বরী পূর্ব্বে বীরভূম অন্তর্গত ছিল, ইদানীং দুমকার অধীন সেকেন্দার নামক গ্রামের সন্নিহিত দ্বারকা নদীর তীরে দেবী মন্দির প্রতিষ্ঠিত; প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম।

বক্রেশ্বর মহাপীঠ। মা মহিষমর্দ্দিনী রূপে বিরাজিত। এই গুপ্ত তীর্থ সাধক গণের সিদ্ধি লাভার্থে আশু ফলপ্রদ। জম্ভেশ্বর জ্যোতিঃ লিঙ্গেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, কুবেরে-শ্বর, ও কালাগ্নি, রুদ্রেশ্বর, এই পাঁচটী অনাদিলিঙ্গ। পাপহরাকুণ্ড, বৈতরণী, শ্বেতগঙ্গা, অগ্নিকুণ্ড, বরুণকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, নৃসিংহকুণ্ড, জীববৎসকুণ্ড, সৌভাগ্যকুণ্ড,

---

* উক্ত ক্ষীরগ্রাম পূর্ব্বে বীরভূম অন্তর্গত ছিল।

অমৃতকুণ্ড, ক্ষারকুণ্ড, এবং ভৈরবকুণ্ড, এই দ্বাদশটী কুণ্ড সর্ব্বদা সুফল প্রদ। মহর্ষি অষ্টাবক্রের প্রতিষ্ঠিত বক্রেশ্বর একটী পরমার্থ পূর্ণ তীর্থ স্থান ও পরম শান্তি স্থান বলিয়া অনুমিত হয়। ভারতের এই চির প্রসিদ্ধ তীর্থে সম্প্রতি ন্যাংটা বাবা নামক একটী পরম সাধক বাস করেন।

কল্যাণেশ্বরী পূর্ব্বে বীরভুমের অন্তর্গত শ্যামরূপার গড়ে ইছাই ঘোষের দ্বারা স্থাপিত হন। পরে পঞ্চ কোটের রাজা কল্যাণসিংহকে দেবী কল্যাণেশ্বরী রজনী যোগে স্বপ্নাদেশ করেন যে "আমি তোমার গৃহে গমন করিলাম, তুমি আমায় তথায় লইয়া স্থাপন কর, আমি তথায় অধিষ্ঠিত রহিব।" এমতে রাজা কল্যাণ উক্ত কল্যাণেশ্বরী দেবীকে বল পূর্ব্বক ইছাই ঘোষের অজ্ঞাতসারে শ্যামরূপার গড় হইতে লইয়ে যান।

ইছাই ঘোষ বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া শুনিলেন যে পঞ্চকোটের রাজা দেবীর স্বপ্নাদেশ মত কল্যাণেশ্বরী দেবীকে লইয়া গিয়াছেন। এমতে ইছাই ঘোষ তাঁহার মিত্র নগরের রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন "আমার স্থাপিতা কল্যাণেশ্বরী দেবীকে পঞ্চ কোটের রাজা কল্যাণ আমার অজ্ঞাতসারে বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছেন আপনি সৈন্য সামন্ত লইয়া আমার এই বিপদে সহায়তা করিলে আমি বিবেচনা করি পথিমধ্যেই কল্যাণেশ্বরী দেবীকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইব।

এবংবিধ সংবাদে নগর রাজ সৈন্য সামন্ত ইছাই ঘোষের সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন। রাজা ইছাই ঘোষ স্বীয় হিন্দুসৈন্য সামন্ত সহ নগর রাজের প্রেরিত মুসলমান সৈন্য একত্রিত করিয়া প্রবল বাহিনী লইয়া রাজা কল্যাণকে আক্রমণার্থ পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। এই রূপে প্রবল বীর রাজা ইছাই ঘোষ বরাকর নদীর অনতি দূরে পঞ্চকোটাধিপতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় রাজা কল্যাণ মনে মনে চিন্তা করিলেন 'এই প্রবল পরাক্রান্ত সৈন্য দলের সহিত আমি সহসা যুদ্ধ করিয়া কিরূপে জয় লাভ করিতে সমর্থ হইব'। এই সকল চিন্তা করিয়া তিনি দেবীকে স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তখন রাজা কল্যাণ আকাশ বাণীতে শুনিতে পাইলেন, মা কল্যাণেশ্বরী তাঁহাকে আদেশ করিতেছেন 'রাজা কল্যাণ কেন তুমি চিন্তা করিতেছ ? যখন আমি তোমার অধিকারে আসিয়াছি তখন তোমার কোন চিন্তা নাই ; তুমি নির্ভয়ে যুদ্ধ কর, স্বল্প সৈন্যেই তোমার জয় লাভ হইবে।

দেবীর আদেশে পঞ্চকোট রাজ সাহ্লাদে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় দলে

প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হইল, অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর ইছাই ঘোষের সৈন্য সমূহ ক্লান্ত ও নিঃশেষিত হইল। তখন রাজা ইছাই ঘোষ পঞ্চকোট রাজাকে স্বয় যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন। তদুত্তরে পঞ্চকোট রাজ বলিলেন "ভাল কথা তোমাতে আমাতেই বাহু বল পরীক্ষা হইবে। মহাপরাক্রমে উভয় রাজা যুদ্ধে ব্রতী হইলেন বীরাগ্রগণ্য ইছাই ঘোষ তখন মনে মনে ভাবিলেন আমি কখনও কোন যুদ্ধে পরাভূত হই নাই, আজ কেন আমার এই বিপুল সৈন্য, পঞ্চকোট রাজার সামান্য সৈন্যের হস্তে পরাভূত ও ক্লান্ত হইল। এ নিশ্চয়ই দেবীর খেলা যা হ'ক আমার জীবন থাকিতে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইব না।

এই রূপে ক্ষণ কাল যুদ্ধ করিতে করিতে কল্যাণেশ্বরীর অনুকম্পায় পঞ্চকোট রাজ অসির আঘাতে রাজা ইছাই ঘোষের মুণ্ড ছেদিত করিয়া ফেলিলেন। পঞ্চকোট রাজ সৈন্য বিপুল জয় ধ্বনি সহকারে চীৎকার করিয়া উঠিল 'জয় কল্যাণেশ্বরী মায়িকি জয়!'

তদনন্তর রাজা কল্যাণ দেবীকে লইয়া বরাকর নদতীরস্থ সুবর্ণপুর গ্রামের প্রান্ত ভাগে উপস্থিত হইলেন সেই খানে একটী রমণীয় হ্রদ, হ্রদের উপরিস্থিত শৈল শিখর চতুষ্পার্শ্বে নিবিড় জঙ্গল তরুলতিকায় নানা জাতি পুষ্প ফুটিয়া গন্ধ বিকীরণ করিতেছে। কুসুমে কুসুমে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে। সেই স্থানের শোভা দেখিয়া শিখর নন্দিনী জগৎপালিনী জগদম্বা পরম প্রীতি লাভ করিলেন। সেই খানে অধিষ্ঠান করিতে মনস্থ করিয়া মা ভারী হইলেন। তখন রাজা মায়ের প্রতিমা ভার সহ্য করিতে না পারিয়া বৃক্ষ মূলে সুশীতল ছায়ায় দেবীকে স্থাপন করিলেন; পরে সৈন্য সামন্ত সহ রাজা কিয়ৎ ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় যখন দেবীকে উত্তোলন করিতে গেলেন তখন দেবী প্রতিমা এত ভার বোধ হইতে লাগিল যে তিনি একা দেবীকে উত্তোলন করিতে অপারগ হইয়া সঙ্গিগণ সহ একত্রে চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরথ হইলেন।

পঞ্চকোট রাজ মনে মনে চিন্তা করত দেবীর ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলে পর আকাশ বাণী শুনিলেন যে এই মনোরম স্থানটিতে থাকিতেই আমার ইচ্ছা, এই স্থানেই আমি থাকিলাম, সে জন্য তুমি দুঃখিত হইও না, আমি তোমার অচলা ভক্তিতে বশীভূত হইলাম, তোমার সর্ব্বদা মঙ্গল হইবে জানিবে। এই প্রকার দেবীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া রাজা স্বদেশ পঞ্চকোট রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। ইহার কিছুদিন পরে উহার নিকটস্থ চলনবিল অর্থাৎ চলনদহের ঘাটে একদা মা একটী ষোড়শ বর্ষীয়া

কন্যারূপে ঐ ঘাটে বসিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিতেছেন এমন সময় একজন শঙ্খ বণিক ঐ ঘাটে নামিয়া জলপান করিয়া উঠিলে মা তাহাকে বলিলেন "ওহে শাঁখারি আমাকে এখানে এক জোড় ভাল শঙ্খ পড়াইয়া দিতে পার?" তখন শাঁখারি তাঁহার রূপলাবণ্যের জ্যোতি দৃষ্টে মনে করিল ইনি সাধারণ ঘরের কন্যা নহেন, কোন উচ্চ বংশীয়া বটেন তখন শাঁখারি বলিল "মা তুমি ঘাটে বসিয়া শঙ্খ পরিলে মূল্য কে দিবে? তবে মা ঘরে চল আমি তোমাকে ভাল শাঁখা পরাইয়া দিব, তখন মা বলিলেন "বাছা তুমি মূল্য পাইবে, আমাকে এই খানে শাঁখা পড়াইয়া দিতে হইবে।" এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে শাঁখারি এক জোড় ভাল শঙ্খ বাহির করিয়া মায়ের হস্তে পরাইয়া দিতে লাগিল, সে সময় তাহার মনোভাব সাত্বিক ভাবাক্রান্ত হওয়ায় সে মনে মনে ভাবিল ইনি প্রকৃত সতী কন্যা, সামান্যা নহেন; আমি আর শাঁখার মূল্য না লইয়া তাঁহার নিকট মঙ্গল কামনাই প্রার্থনা করিব। এমতে শাঁখা পরাইয়া দিয়া শাঁখারি করযোড়ে বলিল 'মা আমি এ সামান্য শাঁখার মূল্য তোমার ন্যায় সতী কন্যার নিকট লইতে ইচ্ছা করি না, তুমি আশীর্ব্বাদ কর আমার মঙ্গল হউক এবং তোমাকে যে ঘাটে শাঁখা পরাইলাম একথা তোমার পিতা, মাতা কি স্বামী শুনিলে ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারেন, কারণ তুমি পূর্ণবয়স্কা যুবতী রমণী তোমায় ঘাটে মাঠে শাঁখা পরানটা আমার উচিত হয় নাই। একথার উত্তরে মা বলিলেন বাছা একথা তোমার পূর্ব্বে প্রকাশ করা উচিত ছিল এখন আমাকে যখন শাঁখা পরাইয়াছ তখন ইহা অপ্রকাশ থাকিবে না, বরং তুমি মূল্য না লইলে অনেকেরই মনে হইবে যে এক জন যুবতী স্ত্রীলোককে লইয়া শাঁখারি বিনামূল্যে শাঁখা পরাইয়া দেয় এবং তুমি যে যুবা কি বৃদ্ধ ব্যক্তি তাহা কি প্রকারে অনুমিত হইবে। এমতস্থলে তোমার মূল্য লওয়াই উচিত সে কথা আমার পিতার জানাই ভাল। আমার স্নান পূজাদি করিয়া ঘাট হইতে বাটী যাইতে গৌণ হইবে; তুমি বরাবর রাস্তা ধরিয়া এই গ্রামের প্রান্ত ভাগে দেবনাথ দেহরি নামক জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করেন, তিনি আমার পিতা, তাঁহাকে যাইয়া বল তোমার কন্যা ঘাটে বসিয়া শাঁখা পরিয়াছেন, সেই শাঁখার মূল্য আমাকে পাঁচ টাকা দিতে বলিয়াছেন যদি তিনি তাহাতে কোন আপত্তি করিয়া শাঁখা না দেখিলে কি প্রকারে পাঁচ টাকা দিব এ প্রস্তাব করেন তখন তুমি বলিবে ভাল শাঁখার মূল্য তিনি পাঁচ টাকা দিতে বলিয়াছেন, আহ্নিকের ঘরের তাকে হলুদ রং করা নেকড়ায় বাঁধা পাঁচ টাকা আছে, ঐ টাকা আমাকে তিনি দিতে বলিয়াছেন,

তাহা হইলে আমার পিতা আর কোন আপত্তি করিবেন না তোমাকে সেই টাকা আনিয়া দিবেন কিন্তু তুমি তাঁহাকে এমন কোন কথা বলিবে না যে পাঁচ টাকার শাঁখা নহে যাহা আপনার বিবেচনা হয় দেন, তাহা হইলে তোমাকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইবে। আমি সন্তুষ্ট হইয়া তুমি বৃদ্ধ শাঁখারি তোমাকে পাঁচ টাকা দিলাম তুমি তাহা যাইয়া গ্রহণ করিয়া আপন বাটীতে যাও তাহা হইলে তোমার সকল মঙ্গল অবশ্য হইবে; আর যদি এবিষয় কোন কথা উচ্চ বাচ্য কর তবে তোমার নিতান্তই অমঙ্গল ঘটিবে। তখন শাঁখারি প্রণাম করিয়া বরাবর দেঘরি ব্রাহ্মণকে অর্থাৎ দেবনাথ দেঘরিকে আসিয়া আমূল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলে, দেঘরি বলিল আমার কন্যা নাই কি প্রকারে কন্যা এ কথা বলিলেন বুঝিলাম না। তখন শাঁখারি বলিল যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তাক খোজ করিলেই প্রমাণ পাইবেন, টাকা দিতেও আপনার কোন বাধা নাই। তখন দেবনাথ বলিলেন "ভাল কথা, অগ্রে তাক দেখি।" এমতে আহ্নিকের ঘরের তাকের উপর ঠিক হলুদ রঙ্গে নেকড়ায় পাঁচটী টাকা বাঁধা আছে, তাহা হস্তে লইয়া ব্রাহ্মণ বাহির বাটীতে আসিয়া বলিলেন "তুমি আমাকে সেই কন্যাকে দেখাইয়া দিলে টাকা দিব। তখন অগত্যা শাঁখারি ও দেঘরি দুই জনেই চলন দহের ঘাটে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া শাঁখারিকে তিরস্কার করায় তখন শাঁখারি মায়ের উদ্দেশে বলিল মা কোথা গেলে তোমার পিতা আমাকে অপমান করিতেছেন দেখা দাও। তখন উক্ত দহের মধ্যস্থলে বাম হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক নূতন শঙ্খ সহিত হস্ত দেখা গেলে দেঘরি কাঁদিয়া বলিলেন 'মা তুমি আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া শাঁখারিকে দর্শন দিয়া হস্তে শাঁখা পড়িলে, আর আমি তোমার রূপ দেখিতে পাইলাম না আমার দুরদৃষ্ট ভিন্ন তোর দোষ কি মা, যাহা হউক আমি তোর প্রদত্ত টাকাই শাঁখারিকে দিলাম, আর তোমাকে বৎসর বৎসর এই সময়ে শাঁখারি ও তাঁহার বংশধরগণ এই স্থানে শাঁখা পরাইয়া দিয়া যাইবে কিম্বা তোমার উদ্দেশে এই ঘাটে দেওয়া হইবে, তাহার ব্যয় আমি ও আমার বংশে যে থাকিবে সেই দিবে। এই বলিয়া দেঘরি ব্রাহ্মণ ও শাঁখারি প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। সেই দিন রজনীযোগে দেবনাথ দেঘরিকে স্বপ্নাদেশ দিলেন যে আমি কাশীপুর রাজাকে স্বপ্ন দিলাম, তুমি কাশীপুর রাজবাটী যাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল বলিলেই, তিনি আমার সেবার জন্য বহু সম্পত্তি তোমাকে সেবাইত নিযুক্ত করিয়া, আমার সেবা পূজার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন আর

যে মাসে যে দিনে আমি শাঁখা পরিলাম, সেই মাসে সেই দিনে বৎসর বৎসর আমার মহামেলা হইবে। সেই মেলায় দিগদিগন্ত হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হইবে; তাহা হইতে তোর বংশাবলির সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। পঞ্চকোটাধিপতি মহারাজ গৌরিনারায়ণ সিংহ বাহাদুর শাঁখারির মুখে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া অনেক সম্পত্তি দান করতঃ সেবার পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া উক্ত দেবনাথ দেঘরিকে সেবাইত পদে নিযুক্ত করিয়া যান। এক্ষণে উক্ত দেঘরি বংশধর রঘুনাথ দেঘরি ও রোহিণী দেঘরি সেবাইত উল্লেখে সেবাদি নির্ব্বাহ করিতেছেন। মাঘ মাসের প্রথম দিনে অদ্যাবধি সেই স্থানে মহামেলা হইয়া থাকে।

সর্ব্বমঙ্গলা দেবী পীঠস্থান—পাঁচড়া ষ্টেশনের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে সর্ব্বমঙ্গলা দেবী বিরাজমানা। ইহার মন্দির অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ১লা মাঘে এখানে সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মেলা হইয়া থাকে।

মহিষ মর্দ্দিনীর পীঠ—কেন্দুলা, জগন্নাথপুর, লোবা বড়ারী কালীতলা। অত্র স্থলে ভৈরব ঘোষ নামক জনৈক কায়স্থ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

সিঙ্গুর গ্রামে বিরূপাক্ষ পীঠ—এই বিরূপাক্ষ পীঠে একটী অনতি বিস্তৃত জঙ্গল আছে। পূর্ব্বে এই জঙ্গল বহু বিস্তৃত ছিল, সেখানে এক জন রাখাল গোচারণ করিতে করিতে দেখিল, একটী বটবৃক্ষমূলে জটাজুটধারী গৈরিক বসন পরিহিত সন্ন্যাসী ধ্যান নিমগ্ন রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে উক্ত রাখাল অনেকক্ষণ করযোড়ে তৎস্থানে অপেক্ষা করার পর উক্ত সন্ন্যাসী চক্ষু মিলিত করিয়া সম্মুখে রাখালকে দেখিয়া বলিলেন "বৎস তুমি এখানে এস, আমি একাদশী ব্রত করিয়া উপবাসী রহিয়াছি; যদি তুমি এই জঙ্গল হইতে কিঞ্চিৎ ফল সঞ্চয় করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমার পারণ হয়। তখন রাখাল বালক বলিল "এখানে সুস্বাদু কোন ফল মূল নাই তবে আপনি যে কোন ফলের আদেশ করিবেন তাহাই অনুসন্ধান করিয়া দেখিব।"

তখন সন্ন্যাসী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "ঐ দেখ, বৃক্ষে সুপক্ক তাল রহিয়াছে ঐ তাল যদি কোন প্রকারে পাড়িয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমার আহার হইতে পারে।

রাখাল বালক সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া সন্নিহিত তাল বৃক্ষে আরোহণ করিল; এবং ক্ষণকাল মধ্যে তাল ছাড়াইতে আরম্ভ করিল; কিন্তু তাল সুপক্ক না হওয়ায়

পড়িল না। তখন রাখাল বালক কাঁদিয় মূলে টান দিল। আকর্ষণ হেতু তাল কাঁদি ছাড়িয়া পড়িল ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক বিপদ হইল তালপত্রে এক ভীমরুলের চাক ছিল ; ভীমরুলের দল বিরক্ত হইয়া সক্রোধে ভন্‌ভন্‌ করিয়া রাখালের সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিতে লাগিল রাখাল ভীমরুলের দংশনে বড়ই বিব্রত হইল। তাতেও রক্ষা নাই সেই বৃক্ষের উপর কোটরস্থিত এক বৃহৎ ফণাধারী সর্প রাখালকে দংশন করিবার উপক্রম করিল। একদিকে ভীমরুলের দংশন, অপর দিকে বিষধরের ভীষণ গর্জ্জন। এই আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া বড় কঠিন হইল। তখন রাখাল অসীম ধৈর্য্য সহকারে বিষধরের ফণা এত জোরে চাপিয়া ধরিল যে তার আর দংশনের শক্তি রহিল না। সর্প রাখালের মণিবন্ধ হইতে কুনুই পর্য্যন্ত বেড়িয়া ধরিল। সর্পকে হস্তমধ্যে চাপিয়া রাখাল বালক ভীমরুলের দংশন সহ্য করিতে করিতে এক হস্তের সহায়তায় ভূতলে অবতীর্ণ হইল এবং অনতিবিলম্বে তাল লইয়া সন্ন্যাসী সান্নিধ্যে উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী তাল পাইয়া প্রীত হইলেন, এবং রাখালের অসীম ধৈর্য্য ও বুদ্ধি কৌশলে বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেন ও রাখালের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তারপর সন্ন্যাসী ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করতঃ রাখালকে সুমধুর সম্বোধনে বলিলেন "বৎস তুমি যেরূপ নীচবংশেই জন্মগ্রহণ কর না কেন, আমি তোমাকে মন্ত্রদান করিব।" রাখাল বলিল "আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ দারিদ্র্যবশতঃ পরের গোচারণ করিয়া দিনপাত করি।" তাহা শুনিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের চিত্ত আরও দ্রবীভূত হইল।

বহুক্ষণ সন্ন্যাসী ঠাকুর রাখালকে উপদেশ দিয়া নিবিড় কানন মধ্যে লইয়া গিয়া সিদ্ধমন্ত্রে তাহাকে অভিষিক্ত করিলেন। তারপর কিছুদিন পরে ভুবনেশ্বর নামা রাখাল সন্ন্যাসীর উপদেশানুসারে শব সাধন করিলেন। পরে ঐ ভুবন রায় নামীয় রাখালই "ভাগলা" নগরের রাজা হইলেন। ইনিই নবাবের ঘরে সাহাজাদা নাম পাইয়াছিলেন।

একদা বিরূপাক্ষ নামক জনৈক সাধক ব্রাহ্মণ লোক পরম্পরায় শ্রুত হইলেন যে ভুবনেশ্বর নামা রাখাল এক্ষণে কোন সন্ন্যাসীর নিকট সিদ্ধ মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধি লাভ করতঃ রাজা উপাধি প্রাপ্ত হওয়ার পর সাহাজাদা নামে অভিহিত হইয়াছে।

এমতে বিরূপাক্ষ একদিবস সাহজাদা রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন 'মহারাজ! আপনি যে সিদ্ধ পুরুষের নিকট দেবীমন্ত্র পাইয়া সিদ্ধিলাভ

করিয়াছেন তাই শ্রবণ করিয়া আমি আসিয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই দেবীকে একবার আমাকে দর্শন করান; কারণ আমি বহুদিন হইতে যোগাবলম্বন পূর্ব্বক দেবী উপাসনায় প্রবৃত্ত আছি; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে এপর্য্যন্ত দেবী দর্শন লাভ ঘটিল না। এক্ষণে আপনি সাধক শ্রেষ্ঠ আপনাকে উপলক্ষ করিয়াও যদি আমার ভাগ্যে দেবী দর্শন ঘটে তাহা হইলেও আমি নিজ জীবন সার্থক মনে করিব।

রাজা বিরূপাক্ষের নিকট এইরূপে স্তুত হইয়া সহাস্যবদনে বলিলেন "হে ব্রাহ্মণ আপনি তাপসশ্রেষ্ঠ তবে আমাকে যে অনুযোগ করিতেছেন তাহা আপনার কৃপা ভিন্ন আর কিছুই নয়। ভালই আপনার সন্তোষের জন্য আমি কল্যই প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে দেবী আরাধনায় নিযুক্ত থাকিব; সে সময় আপনি উপস্থিত হইবেন আমি সাধ্যমত আপনাকে দেবীরদর্শন দিবার জন্য চেষ্টা করিব তাহাতে যা আদেশ হয়, স্বকর্ণে শুনিবেন।

এমতে পরদিবস রাজার নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিরূপাক্ষ রাজসমীপে উপস্থিত হইলে রাজা অনেকক্ষণ দেবীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া দেখিলেন কিছুতেই দেবীর শুভাগমন হইল না। তখন বিরূপাক্ষকে লক্ষ্য করিয়া রাজা কহিলেন "আমি যত সময় দেবী আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া গত করিলাম অন্যান্য দিন এত সময় লাগে না, অল্প সময়ে দেবীর দর্শন হয়, আজ আশ্চর্য্যের কথা এত বিলম্বেও দেবীর দর্শন পাইলাম না। তবে আপনি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন আমি আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।

এই বলিয়াই রাজা পুনর্ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন, এবং পরে দৈববাণী হইল "শক্তি মন্ত্র সাধক বিরূপাক্ষ তোমার আহ্নিক ঘরের দ্বারে অবস্থান করা হেতু আমি তাঁহাকে উল্লঙ্ঘনও উপেক্ষা করিয়া তোমায় দর্শন দিতে পারিতেছি না।"

তখন রাজা বলিলেন "হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! শুনিলেন দেবীর আদেশ কি হইল? অতএব আপনি দরজা ছাড়িয়া স্থানান্তরে অপেক্ষা করুন, আমি আপনার বক্তব্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি কিম্বা আপনি নিজ বক্তব্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন।"

এমতে বিরূপাক্ষ দ্বার ত্যাগ করিয়া অন্যত্র অবস্থান করিলেন, তখন রাজার উপাস্য দেবী রাজাকে দর্শন দিলেন; রাজা বলিলেন "হে বিরূপাক্ষ আপনার বক্তব্য দেবীকে জিজ্ঞাসা করুন।"

তখন করযোড়ে বিরূপাক্ষ ধ্যানস্থ হইয়া জানিলেন যে যাঁহাকে রাজা দেবী

মনে করিতেছেন তিনি দেবী নহেন, নায়িকা" ইহা বুঝিয়া তিনি নায়িকার নিকট প্রার্থনা করিলেন "হে নায়িকা দেবী তুমি দেবীর নিকটস্থ সখিশক্তি, তোমার নিকট আমি এই প্রার্থী, আমি এ যাবৎ দেবীর উপাসনা করিয়া মায়ের সাক্ষাৎলাভে কেন বঞ্চিত হইয়া আছি তাহা আপনি মায়ের স্থানে জানাইয়া মহামায়ার আদেশ; আমাকে জানাইলে এ দাস কৃতার্থ হইবে।

তখন নায়িকা বলিলেন "ইহার সদুত্তর আমি সপ্তাহ মধ্যে দিব। নায়িকা ইহা বলিয়াই অন্তর্হিত হইলেন; এবং রাজা সাধনাগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বিরূপাক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হে বিপ্রপ্রধান দেবীর আদেশ তো শুনিলেন" তখন বিরূপাক্ষ ঈষৎহাস্য করতঃ বলিলেন "আপনি যাহাকে দেবী মনে করিতেছেন, তিনি পরমারাধ্যা দেবী নহেন দেবীর সখি নায়িকা; আমি ইহাঁকে চাহি না আমি জগন্মায়া ব্রহ্মময়ীর প্রার্থী।

তখন রাজা তাঁহার এইরূপ বাক্যশ্রবণে ঘূর্ণিত লোহিত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন "তুমি ব্রাহ্মণ না হইলে তোমাকে বিনাশ করাই আমার কর্ত্তব্য ছিল; তবে তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান; সেই জন্যই তোমায় মুক্তি দিলাম। যিনি আমার আরাধ্যা তিনি দেবী হউন বা নাই হউন সে বিচার তোমার সহিত করিতে চাহি না আমি তাঁহাতেই দেবীলাভে সক্ষম হইব।" ইহা ধ্রুব নিশ্চয় জানিও। তখন বিরূপাক্ষ তথা হইতে নানা পীঠ পর্য্যটনান্তে নায়িকার নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজবাটী সন্নিকটস্থ একটী বিল্ববৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ হইয়া নায়িকা দেবীকে স্মরণ করিবামাত্র নায়িকা দেবী উপস্থিত হইয়া বিরূপাক্ষকে বলিলেন "মা এই আদেশ করিলেন যে তোমার মন্ত্র বিশুদ্ধ নয়, সেই মন্ত্রাশুদ্ধি হেতুই তুমি তাঁর দর্শন পাও না, তখন আমি তাঁকে অনুনয় বিনয় করিয়া ধরায় তিনি বিল্বপত্রে এই দেখ মন্ত্র লিখিয়া দিয়াছেন, এই নাও সেই বিল্ব পত্র" এই বলিয়া সেই বিল্বপত্র নায়িকা দেবী বিরূপাক্ষ ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিলেন।

বিরূপাক্ষ সেই বিল্বপত্র লিখিত মন্ত্র পাঠান্তে পদদলিত করিয়া সক্রোধে নায়িকাকে বলিলেন "মাকে বলিও আমার গুরুদত্ত মন্ত্রই শুদ্ধ, ইহাতে তিনি দেখা দেন আর নাই দেন।"

তৎপরা বিরূপাক্ষ পুনরায় সেই বিল্ববৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ হইলে সমস্ত দিবস গত হইয়া রজনী ঘোর নিশাকালে দেবী আদ্যাশক্তি তৎবিল্বমূলে আবির্ভূতা হইয়া দৈব

বাণী দ্বারা বলিলেন "হে সাধকশ্রেষ্ঠ সন্তান তোমার অচলা গুরুভক্তিতে আমি সন্তুষ্ট হইয়া আজ তোমাকে দর্শন দিতে উপস্থিত হইয়াছি, তুমি নয়নোন্মিলন করত আমার স্বরূপ দর্শন কর।"

তখন বিরূপাক্ষ অবনত মস্তকে মাতৃচরণে পতিত হইয়া সাশ্রুনয়নে গদগদ চিত্তে মায়ের সেই দক্ষিণা কালিকার স্তব করিলেন। মা স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বর তুমি চাও।"

তখন বিরূপাক্ষ করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন 'তুমি যেমন মা বিনাপরাধে এ যাবৎ কাল দর্শন দাও নাই সেই জন্যই আমি এই বর প্রার্থী যে, যে কোন পীঠে আমি তোমার উপাসনাতে রত হইব, আমার এই সিদ্ধাসন প্রস্তরখানি সেই পীঠে বহন করিয়া দিতে হইবে। দেবী "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

নান্নুর গ্রামের চণ্ডীদাস

পূর্ব্বকালে নান্নুর গ্রামে সকলেই প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিই শক্তিসাধক ছিলেন। কেবল চণ্ডীদাস কৃষ্ণসেবায় রত ছিলেন। এই হেতু গ্রামের শক্তি সাধকগণ তাঁহাকে আপন দলভুক্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা সত্ত্বেও চণ্ডীদাস তাঁহাদের দলভুক্ত না হইয়া কৃষ্ণসেবায় রত ছিলেন।

এমতে গ্রামস্থ জন সাধারণ তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিলেন।

একদা রজনীযোগে চণ্ডীদাস স্বপ্নে দেখিলেন যে " বাসুলী দেবী তাঁহার শিরোদেশে আসিয়া বলিতেছেন "হে চণ্ডীদাস তোমার অন্তরে শাক্ত বৈষ্ণবে বিভিন্ন ভাব অদ্যাবধি বর্ত্তমান এমতে তুমি কিছুতেই সেই রাধাশক্তি উপাসক কৃষ্ণের দর্শন পাইবে না। সেই জন্য তোমায় উপদেশ দিতেছি শুন, যে রাধাশক্তি সেই আমি বাসুলী দেবী একই শক্তি বিশেষ। তুমি অন্য ভাব ত্যাগ করিয়া শিবশক্তি ও রাধা কৃষ্ণ একই বস্তু মনে করিয়া আমার দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ কর। আমার প্রিয়সখি রামিমণি ধোপানী, তাহাকেই তুমি স্বীয় শক্তি রূপে গ্রহণ করিয়া আমার অর্চ্চনা কর। তাহা হইলে তুমি কৃষ্ণপদ অতি সত্বরে প্রাপ্ত হইবে।"

স্বপ্নান্তে চণ্ডীদাস অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পরদিন প্রভাতেই রামমণিকে বিরলে ডাকিয়া দেবীর আদেশ সমস্ত বলিলেন। তখন রামমণি তাঁহার প্রস্তাবে

সন্মতা হইয়া বলিলেন "চণ্ডীদাস, আমি পূর্ব্ব হইতেই শিবশক্তির প্রেমে মগ্ন রহিয়াছি, কিন্তু উপযুক্ত শক্তি সাধক ভৈরব ব্যতিরেকে যুগল উপাসনায় সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারি নাই। যখন মায়ের এরূপ আদেশ তোমার প্রতি হইয়াছে তখন তোমাকেই আমি প্রকৃত ভৈরব পুরুষভাবে গ্রহণ করিলাম অদ্য হইতে তুমি আমি এক হইয়া উপাস্য পদে জীবন শেষ করিব।"

এমতে চণ্ডীদাস দেবী কর্ত্তৃক যে মন্ত্র পাইয়াছিলেন তাহাতেই রামমণিকে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাকেই শক্তিরূপে গ্রহণ করিলেন এবং উভয়ে একচিত্ত ও একমন হইয়া সেই পরম শিব শক্তির উপাসনায় রত হইয়া চণ্ডীদাস সিদ্ধিলাভ করেন।

চণ্ডীদাস রামমণি ধোপানীর সহিত বাসুলী দেবীর মন্দিরে জপ তপাদি করায় গ্রামস্থ সকলেই চণ্ডীদাসের প্রতি অতিশয় রুষ্ট হইয়া চণ্ডীদাসকে বাসুলী দেবীর পূজক পদ হইতে পদচ্যুত করিলেন; এবং রামমণিরও দেবীর প্রসাদ পাওয়া বন্ধ হইল।

ওই সময় চণ্ডীদাস এক দিন পীড়ার ভাণ করিয়া একটী পর্ণকুটিরে শয়ন করিয়া রহিলেন; দিনমণি অস্তগমন পর্য্যন্ত গ্রামের কেহই তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না বা এক গণ্ডুষ জল দিয়াও সাহায্য করিল না। এইরূপে তৃতীয় দিবসে গ্রামে গুজব উঠিল চণ্ডীদাসের মৃত্যু হইয়াছে।

গ্রামের লোকে তখন চণ্ডীদাসের শব সৎকারার্থ শ্মশানে লইয়া গেল। চিতা সজ্জিত হইল, চিতায় চণ্ডীদাসের দেহ স্থাপিত হইল চিতায় অগ্নিসংযোগ হইবে এমন সময় রামমণি সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিরহোন্মাদিনী রাধিকার ন্যায় রামমণি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "হা প্রাণেশ তুমি এ দাসীকে ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলে? তোমার সেই বদন চন্দ্র না দেখিয়া আমার হিয়ায় আর ধৈর্য্য ধরিতেছে না হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে" এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ বাক্যে শ্মশানভূমি কাঁপিয়া উঠিল। চীৎকার ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই চিতার উপর চণ্ডীদাসের দেহ যেন চঞ্চল হইল এবং ক্ষণ পরে নিদ্রোত্থিতের ন্যায় চণ্ডীদাস চিতাস্থান হইতে লম্ফপ্রদানে রামমণির সমীপস্থ হইয়াও তাঁহাকে ক্রোড়ে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন রামমণিও আনন্দে তাঁহার সহিত নৃত্যে যোগ দিল এবং চণ্ডীদাস এই সময় রামমণিকে বলিলেন "এস্থান আর আমাদের থাকার যোগ্য নহে, চল আমরা বৃন্দাবন যাত্রা করি।"

রামমণি তাঁহার এই প্রস্তাবে সম্মতা হইয়া উভয়েই দেহত্যাগে সমাধি লাভ করিলেন।

ইহার মধ্যে আরও অনেকগুলি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে যে একবার চণ্ডীদাসের পরমাত্মীয়গণ তাঁহাকে রজকিনীর বাটী হইতে বলপূর্ব্বক গৃহে আনেন। তখন চণ্ডীদাস দিন রাত্রিই রামমণির বাটীতেই থাকিতেন। বাড়ীতে আনিয়া চণ্ডীদাসের আত্মীয়গণ তাঁহাকে স্বজাতিভুক্ত করিয়া লইবার ব্যবস্থা করেন। ওমতে ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন হইল, চণ্ডীদাস সেইদিন ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর আহারের পরিবেষ্টা হইয়া অন্নের থালা হাতে লইয়া ব্রাহ্মণগণকে অন্ন পরিবেশন করিতেছেন; এমন সময় রামমণি শুনিলেন চণ্ডীদাস "জাতিতে উঠিতেছেন," অমনি তিনি কাপড়ের মোট মাথায় লইয়া চণ্ডীদাসের বাটি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চণ্ডীদাসের হাতের অন্নের থালা সহসা সম্মুখে ব্রাহ্মণ ভোজন স্থানে অভিমানিনী রামমণি চণ্ডীদাসকে দেখিয়াই বলিলেন "কিরে চণ্ডী তুই নাকি জেতে উঠছিস, বাট্?" তখন যেন রাম মণির আরও দুইটী বাহু পরিদৃষ্ট হইল। ইনি যেন সেই নবীন বাহুদ্বয় দ্বারা চণ্ডীদাসের পতোন্মুখ ভাতের থালা ধরিলেন; চণ্ডীদাসও ভাতের থালা ছাড়িয়া সস্নেহে রামমণিকে আলিঙ্গন করিলেন। তদনন্তর উভয়েই ত্রস্ত পদে সে স্থান হইতে প্রস্থান পরিচয় করিলেন!

পরে তাঁহার আত্মীয়েরা আর তাঁহাকে জাতিতে আনিতে চেষ্টা করেন নাই বা পরে তাহাদিগকে আর গ্রামে দেখিতে পান নাই।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সম সাময়িক; কারণ বিদ্যাপতি একবার চণ্ডীদাসকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের সহিত বিদ্যাপতির সৌহার্দ্দ্য খুবই হইয়াছিল। চণ্ডীদাস পূর্ব্বরাগ প্রেমবৈচিত্র খণ্ডিতা এবং ভাবসম্মিলন বর্ণনে অসামান্য কবিত্বের দিয়াছেন।

নিত্যানন্দ প্রভু ও পদকর্ত্তা জ্ঞানদাসের বিবরণ।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত এক চক্রা গ্রামে মহাত্মা নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব। এই এক চক্রা গ্রাম ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথে লুপ লাইনের মল্লারপুর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী, এই এক চক্রা গ্রামে দুই কি আড়াই ক্রোশ পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রাম, ঐ কাঁদড়া গ্রামের মঙ্গল ব্রাহ্মণ বংশ এতঅঞ্চলে বিখ্যাত জ্ঞানদাস উক্ত মঙ্গল বংশেই জন্মগ্রহণ

করেন সেই জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে মঙ্গল ঠাকুর ও কেহ কেহবা শ্রীমঙ্গল ও কেহ বা তাঁহাকে মদন মঙ্গল বলিয়া সম্বোধন করিত। "ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে জ্ঞানদাসের পরিচয় এই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়।" ১৫২৯ কি ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবী দেবীর নিকট ইহাঁর দীক্ষা। কাঁদড়া গ্রামে অদ্যাপি জ্ঞানদাসের একটি প্রাচীন মঠ বিদ্যমান রহিয়াছে প্রতি বৎসর পৌষ পূর্ণিমায় তথায় মহামহোৎসব ও মেলা হইয়া থাকে অদ্যাপিও ঐ মেলার দিন বহু বৈষ্ণব ও অতিথিগণের সমাগম হইয়া থাকে।

জয়দেব গোস্বামী।

জয়দেব সম্বন্ধে শাস্ত্র প্রবাদ বাক্যে প্রকাশ যে পূর্ব্বজন্মে জয়দেব মুচুকুন্দ রাজা ছিলেন। এজন্মে উনি জয়দেব রূপে বিখ্যাত। তাঁহার পত্নী পদ্মাবতী, তিনি পূর্ব্ব জন্মে মুচুকুন্দ রাজার প্রধানা মহিষী ছিলেন। এজন্মে পদ্মাবতী নামে অভিহিত ও জগন্নাথ ক্ষেত্রে অর্থাৎ পুরীধামে হরিদাস পাণ্ডার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। হরিদাস ঐ কন্যা জন্মাইবার পরেই প্রতিজ্ঞা করেন "এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা আমি জগন্নাথ প্রভুকে অর্পণ করিব।"

কিন্তু ক্রমে যখন কন্যা বয়স্থা হইল তখন পাণ্ডা সাতিশয় চিন্তিত মনে এক দিবস পুরীধামে জগন্নাথ প্রভুর নিকট সকরুণ ভাবে প্রার্থনা করিলেন হে প্রভো আমি এ সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যার উপযুক্ত পতি কোন্ স্থানে অন্বেষণ করিব? আমার তোমার কার্য্যেই সমস্ত দিন ক্ষেপণ হয় ক্ষণমাত্রও অবসর নাই; হে প্রভো তুমিই দয়া করিয়া আমার কন্যাকে গ্রহণ কর নচেৎ এদাসের আর উপায়ান্তর নাই।"

সেই দিবস রজনীযোগে জগন্নাথ প্রভু হরিদাস পাণ্ডার শিরোভাগে উপস্থিত হইয়া স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন "হে পরম সাধক হরিদাস, তোমার কন্যাকে আমার

হস্তে অর্পণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছ, ভালই তুমি বীরভূমের অন্তর্গত কেন্দুলী গ্রামের জয়দেব গোস্বামী নামক আমার পরমভক্তকে কন্যা প্রদান কর, তাঁকে কন্যা অর্পণ করিলেই আমাকে কন্যা অর্পণ করা হইবে। কারণ তাঁহাতে ও আমাতে কোন প্রভেদ নাই সে আমার পরম ভক্ত।”

এইরূপ স্বপ্নাদেশের পর হরিদাস পাণ্ডা স্বীয় কন্যা সমভিব্যাহারে জয়দেব গোস্বামীর অনুসন্ধানে কেন্দুলী গ্রামে উপস্থিত হইয়া গ্রামস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন “এখানে জয়দেব গোস্বামী নামে কোন ব্যক্তি আছেন কি” তখন অনেকে চিন্তা করিয়া বলিল “ঠাকুর এখানে জয়দেব গোস্বামী বলিয়া কেহ নাই, তবে জয়া খেপা নামে এক ব্যক্তি অজয় তটে শ্মশানে আছেন; কিন্তু সে স্থানে আপনার ন্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের যাওয়া বড়ই দুষ্কর তাহার যে তিনটী শবভক্ষক কুকুর আছে সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে তাহারা শয়ন করিয়া থাকে। কোন অপরিচিত লোক তথায় উপস্থিত হইলেই কামড়াইতে আসে। এবিষয়ে সাবধান হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করুন।”

তখন পাণ্ডা ঠাকুর মনে মনে চিন্তা করিলেন “যে যখন জগন্নাথ দেব স্বপ্নাদেশ দিয়াছে তখন অবশ্যই শ্মশানবাসী জয়দেব গোস্বামী হইতে পারেন। যা হউক আমার কোমলাঙ্গী সুখ স্বচ্ছন্দ পালিতা কন্যা সেই শ্মশানবাসীকে কেমন করিয়া অর্পণ করি। কেমন করিয়া ফল মূলাহারে সেই সুখপালিতা কন্যা কঠোর সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বনে সন্ন্যাসিনী হইবে? যাই হউক সে ভাবনায় আমার দরকার নাই প্রভু যে আদেশ আমাকে দিয়াছেন, আমাকে তাহাই পালন করিতে হইবে।” এই সুদৃঢ় সঙ্কল্প আঁটিয়া হরিদাস পাণ্ডা স্বীয় কন্যার সহিত শ্মশানে জয়দেব উদ্দেশে গমন করিলেন। তখন পাণ্ডাকে দেখিয়া ত্রিকালজ্ঞ জয়দেব যোগী ধ্যানস্থ হইয়া সমস্ত জানিলেন ও প্রভুর প্রেরিত পাণ্ডাকে বিশেষ সম্মানের সহিত বসাইলেন ও জিজ্ঞাসিলেন “আপনি কি জন্য এখানে আসিয়াছেন? তাহা আমাকে জানাইয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।

পাণ্ডা বলিলেন “আমি জগন্নাথ ধামের প্রভুর পাণ্ডা, আমার এই পরমা সুন্দরী কন্যা প্রভুকে দিব মনন করিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রভু রজনীযোগে স্বপ্নাদেশে আপনাকে কন্যা সমর্পণ করিতে বলেন। তাঁহার সেই আদেশানুসারে আমার এই কন্যা সমভিব্যাহারে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি আমার এই সর্ব্বগুণান্বিতা কন্যাকে আপনাকে গ্রহণ করিতেই হইবে।

তদুত্তরে জয়দেব বলিলেন "আমার সঙ্কল্প এই যে কখনও আমি রমণীর ছায়াও স্পর্শ করিব না এমতাবস্থায় কিরূপে কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারি।"

তখন পাণ্ডা বলিলেন "প্রভুর আজ্ঞা হইলে কোন কার্য্যের বাধা হইতে পারে না এমতস্থলে আপনার কন্যাগ্রহণে কোন আপত্তি নাই, কারণ আপনি শাস্ত্রজ্ঞ ও প্রভুর পরম ভক্ত।"

তখন জয়দেব গোস্বামী মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিলেন "আমি প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ নহি, কিন্তু আপনার এই সুখ সেব্যা কন্যা আমার সঙ্গে থাকিয়া ভস্মাদি লেপন দ্বারায় ফল মূল আহার করতঃ অতি কষ্টে দিনযাপন করিতে পারিবেন কি ?

হরিদাস পাণ্ডা জয়দেবকে শুদ্ধ কলেবর জানিয়া পদ্মার বিবাহ দিবার যোগ্য পাত্র বিবেচনায় তাঁহার করে পদ্মাবতীকে অর্পণ করিলেন।

জয়দেব ধ্যানে জানিলেন "ইনিই আমার চিরসঙ্গিনী" তখন আনন্দচিত্তে পদ্মাবতীকে গ্রহণ করিলেন।

কেন্দুলী গ্রামে জয়দেব বাস করিয়া প্রত্যহ কাটোয়ায় গঙ্গাস্নানে গমন করিতেন, একদা তাঁহার শরীর অসুস্থ হইলে, তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন, এবং গঙ্গামাতার ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলে আকাশবাণী হইল যে বাছা, তুমি আমার পরম ভক্ত, আর তোমাকে কষ্ট স্বীকার করিয়া কাটোয়ায় গঙ্গাস্নানে যাইতে হইবে না তুমি যত দিন কেন্দুলী গ্রামে থাকিবে, আমি প্রত্যহ এই অজয় নদীতে যখন উজান বহিবে তখন জানিবে আমি আসিয়াছি ; তোমার স্নানাদি পূজা পাঠ শেষ হইলে আমি যথা স্থানে গমন করিব। মায়ের এই বাক্যে জয়দেব করযোড়ে বলিলেন "মাতঃ ! যদি কৃপা করিয়া প্রত্যহ দর্শন দিবে ইহা আমার পরম ভাগ্য, কিন্তু মা তুমি যখন এতই অনুগ্রহ করিলে, তখন আমার এই শেষ প্রার্থনাটী পূরণ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না মা আমার অন্তে বৎসরান্তে একবার তুমি যে কোন সময় এই অজয় নদীতে আসিয়া অত্রস্থ পাপী তাপীগণকে উদ্ধার করিবে ইহা স্বীকার করিলে অধম সন্তান কৃতার্থ হইবে। তখন গঙ্গাদেবী "তথাস্তু" বলিয়া এই আদেশ করিলেন যে বৎসরান্তে পৌষ সংক্রান্তি দিনে আমি অজয় নদীতে আগমন পূর্ব্বক এস্থান পবিত্র করিব ; সেই

সময়ে অজয়ের জলরাশি বৃদ্ধি পাইবে ও উজান বহিবে ; এমতে এখন উক্ত দিনে কেন্দুলী গ্রামে মহামেলা হইয়া থাকে। তদনন্তর কিয়দ্দিবস পদ্মাবতী সহ কেন্দুলী গ্রামে থাকিয়া জয়দেব গোস্বামী রাধাকৃষ্ণ লীলার গীতিগ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। প্রত্যহ তাঁহার স্নান আহ্নিক জপাদি কার্য্য শেষ করিয়া এক চিত্তে কৃষ্ণ প্রেমলীলা পদ সকল যে সময় রচনা করিয়া তদ্গত চিত্তে যখন সেই পদাবলী আবৃত্তি করিতেন, সেই সময় তৎস্থানীয় কদম্ব মূলে থাকিয়া ভগবান ঐ সকল পদাবলী শ্রবণ করিতেন ; পরে জয়দেব অন্যমনস্ক হইলেই তাহার কিয়দংশ করিয়া প্রত্যহ অপহরণ করিতে থাকেন এবং সেই সকল পদাংশ জগন্নাথ ধামে তাঁহার ভক্ত গায়ক পাণ্ডাকে স্বপ্নাদেশ প্রদান করত বলিলেন "এই সকল পদমালা আমার কীর্ত্তন করিলে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিব। এইরূপে প্রত্যহ জয়দেব কৃত রাধাকৃষ্ণ বিলাস পদাবলী সকল ক্রমে কিছু কিছু কেন্দুলী হইতে সংগ্রহ পূর্ব্বক, প্রভু তাঁহার প্রিয় পাণ্ডা গায়ককে দিতে থাকেন ; এমতে ৺জগন্নাথ পুরী ধামে ঐ সংগৃহীত পদাবলী ক্রমে একখানি সুবৃহৎ রাধাকৃষ্ণ লীলার পদাবলী গ্রন্থ হইয়া উঠিল।

এদিকে এক দিবস স্নান আহ্নিকের পর যে সময় জয়দেব পদাবলী সকল রচনা করিতে ছিলেন ; সেই সময় তাহার মনোমধ্যে উদয় হয় যে মহাশক্তির প্রাধান্য ও পূর্ণ রস রচনা করিতে হইলে শ্রীমতীর মানভঞ্জন হেতু ভগবান্‌কে তাঁহার পদ মস্তকে ধারণ না করাইলে পূর্ণরসের পরিস্ফুট হয় না, কিন্তু তাহা আমি কি প্রকারে স্বহস্তে লিখিব, এই প্রকার নানা চিন্তা মনোমধ্যে করিয়া পদাংশ শেষ করিতে বাকী রাখিয়া জয়দেব একদা গঙ্গাস্নানে গমন করিলে, ভগবান্ জয়দেবের রূপ ধারণ করত কিয়ৎ-ক্ষণ পরে জয়দেব কুটীরে উপস্থিত হইয়াই পদ্মাবতীকে বলিলেন, আমার যে গীত রচনা গ্রন্থখানি রাখিয়া এই মাত্র স্নান হেতু গমন করিয়াছিলাম কিন্তু কিয়দংশ পথ যাইয়াই আমি যে অংশ পদ লিপিবদ্ধ করিয়া যাই তাহার অপরাংশ পদ যে ভাবে লিখিলে পদের রচনাটী অতি সুন্দর হইতে পারে তাহাই মনে উদয় হওয়ায় আমি পথ হইতে পুনঃ প্রত্যাগমন করিলাম তুমি আর বিলম্ব না করিয়া সত্বর গ্রন্থখানি বাহির করিয়া দাও জয়দেবের এবম্প্রকার উক্তিতে পদ্মাবতী কুটীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পদাবলী গ্রন্থ আনিয়া তাঁহার হস্তে দিয়া তিনি সেবার জন্য রন্ধনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে জয়দেব কৃত পদাবলী বাহির করিয়া যে অংশ পদাবলী

শেষ না করিয়া অসম্পূর্ণ অংশ যাহা ছিল সেইস্থানে কেবল (দেহি পদ পল্লবমুদারম্) কথা কয়েকটী যথাস্থানে সন্নিবেশিত পূর্ব্বক ভগবান, উক্ত গ্রন্থখানি যে ভাবে বাঁধা ছিল সেই ভাবে বাঁধিয়া পদ্মাবতীকে ডাকিয়া তাঁহার হস্তে গ্রন্থখানি দিয়া বলিলেন "আমি অদ্য আর স্নানে গমন করিব না শরীরটা অসুস্থ বোধ হইতেছে বাটীতেই স্নান আহ্নিক করিতেছি তুমি ভোগের জন্য অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া রাধা মাধবের মন্দির মধ্যে লইয়া আইস, আমি মন্দির মধ্যে যাইয়া পূজাদি শেষ করিগে।"

এই বলিয়া জয়দেব রূপী ভগবান নিজের অর্চ্চনা নিজেই করিতে প্রবৃত্ত হন সেটি কেবল লোকাচার রক্ষার জন্য মাত্র। এই ভাবে যখন তিনি ৺রাধামাধবের পূজায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় পদ্মাবতী অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া ভোগার্থে সমস্ত উপস্থিত করিলে ভগবান চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে পদ্মাবতীকে ডাকিয়া বলিলেন "ভোগাদি কার্য্য শেষ হইয়াছে এখন তোমার আমার প্রসাদ পাইতে বিলম্ব কেন?" তখন পদ্মাবতী বলিলেন "আপনার সেবার পর, দাসী যে ভাবে প্রসাদ পাইয়া থাকে তাহাই হইবে।" তখন ভগবান আহার করিয়া মুখাদি প্রক্ষালন করতঃ পদ্মাবতীর নিকট তাম্বুল গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন "তুমি এখন আহার কর, আমি একটু শয্যায় বিশ্রাম করি, এই বলিয়া জয়দেবের শয়ন কুটীরে প্রবেশ করিয়া ভগবান শয়ন করিলেন, কিন্তু পদ্মাবতী তখন প্রসাদ গ্রহণ না করিয়া শয়নমন্দিরে যাইয়া প্রভুর পদ সেবা করিতে করিতে তাঁহার মনে কি এক অপরূপ ভাবের আবির্ভাব হওয়ায় তিনি প্রভুর পদ সেবাতে তন্ময় হইয়া বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া এক দৃষ্টে ভগবানের সেই অপরূপ মাধুর্য্যময় ভাবে আক্রান্ত হইয়া একবারে স্তম্ভিত হইয়া পরায় প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া স্বীয় ঐশ্বরিক ভাব সম্বরণ পূর্ব্বক মানব ভাবের উদয়ে মহামায়ার মায়ায় তৎক্ষণাৎ পদ্মাবতীকে আচ্ছন্ন করিয়া মধুরবাক্যে বলিলেন "তুমি আহার কখন করিলে, আমার শয়নকক্ষে আমার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি এখানে আসিলে। ভগবানের বাক্য শ্রবণে পদ্মাবতী করযোড়ে বলিলেন "প্রভু এখন আপনার পদসেবা কার্য্য শেষ হইল, আপনি কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করুন, আমি প্রসাদ পাইতে চলিলাম।" তখন প্রভু মৃদুমন্দহাস্যে বলিলেন "হা সতী! আমি তোমাকে আমার ভোজনের পরই আহার করিতে বলিয়াছি তুমি এ পর্য্যন্ত আহার কর নাই, যাও সত্বর আহার কর গে।"

এমতে পদ্মাদেবী প্রসাদ ভক্ষণ করিতেছেন আর ভাবিতেছেন, এমন সুস্বাদু প্রসাদ অন্য দিন খাই নাই, আজ কেন এমন সুস্বাদ ও সুঘ্রাণ পাইতেছি ?" এমন সময় জয়দেব আসিয়া এদিক ওদিক দেখিয়া যে পাকের গৃহে পদ্মাবতী আহার করিতেছিলেন সেখানে দর্শন দিয়াই বলিলেন "পদ্মা অদ্য আমার আহার না হইতে তুমি আহারে বসিয়াছ, বোধ করি আমার স্নান করিয়া আসিতে অধিক বিলম্ব হইয়া থাকিবে ; কিন্তু ৺সেবাদি কাহার দ্বারা করাইলে ?" তখন পদ্মাবতী বলিলেন "এই যে প্রভু তুমি স্নান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তোমার রাধাকৃষ্ণ লীলা বর্ণনা গ্রন্থখানি আমার নিকট চাহিয়া লইয়া তাহাতে কি লিখিয়া রাধাগোবিন্দের মন্দিরে তাঁহার সেবা পূজা করিয়া আমার প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনাদি প্রভুকে দিয়া নিজে আহার করিয়া তুমি শয়নগৃহে বিশ্রাম করিলে, তোমার পদসেবা করণান্তর তোমারই আজ্ঞামতে আমি প্রসাদ ভক্ষণ করিতেছি এক্ষণে তুমি আবার এরূপ কথা বলিতেছ কেন ইহা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি, তোমার অদ্য শরীর অসুস্থর কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছিলে সেই জন্যই কি তোমার মতিভ্রম জন্মিল আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না তখন জয়দেব সবিস্ময়ে বলিলেন 'একি কথা ! আমি এই মাত্র গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছি, আমি কখন আমার পদাবলী গ্রন্থ লিখিলাম, কৈ সে গ্রন্থখানি আন দেখি আমি কি লিখিয়াছি, একবার দেখি তাহা হইলে আমি সকল বুঝিতে পারিব ।" জয়দেবের এবম্প্রকার উক্তিতে আহার স্থান ত্যাগ করিয়া মুখাদি ধুইয়া পদ্মাবতী সেই পদাবলী গ্রন্থ আনিয়া জয়দেব হস্তে অর্পণ করিলে জয়দেব অগ্রেই সেই স্থান দেখিলেন যে স্থানের কথাংশ লিখিয়া ভগবানকে শক্তির চরণ শিরে স্থাপন না করিলে লীলার সম্পূর্ণ লীলার মাধুর্য্য হয় না। কিন্তু কিপ্রকারে প্রভুর এলীলা স্বীয় লেখনীমুখে লিখিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বেলা অধিক হয় দেখিয়া তাহারই চিন্তা করিতে করিতে গঙ্গাস্নানে গমন করেন, এক্ষণ উক্ত স্থানের অবশিষ্ট চরণটুকু দেখিলেন, পূর্ণ হইয়াছে চরণের শেষ অংশ টুকু "দেহি পদ পল্লব মুদারম্",লিখিত হইয়া চরণটি পূর্ণ হইয়াছে।" তখন জয়দেব বুঝিলেন ইহা সেই কৃপাময়ের লীলা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি আমার স্বরূপ দর্শন দিয়া পদ্মাকে ভুলাইয়া স্বীয় কার্য্য শেষ করিয়া প্রভু অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন ; যাহা হউক আমি অভাগা, নচেৎ কেন প্রভুর দর্শন লাভে বঞ্চিত হইব পদ্মাবতী আমাপেক্ষা ভাগ্যবতী বঞ্চিত হইবে

না হইলে তাহাকে দর্শন দিয়া এবং তাহার চর্ম্ম হস্তে স্বীয় অঙ্গ স্পর্শ করাইয়া ও তাহাকে প্রসাদ ভক্ষণ করাইয়া প্রভু স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন আর এ অভাগা তাহার কণামাত্র উপভোগ করিতে বঞ্চিত হইল। এইরূপ আক্ষেপ বাক্যে ক্রন্দন করিতে করিতে সেই মহাপ্রসাদ যাহা পদ্মাবতী গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল দৌড়িয়া যাইয়া তাহা ভক্ষণ পূর্ব্বক আনন্দে প্রেমাশ্রু বিগলিত নেত্রে নৃত্য করিয়া স্বীয় রচিত পদাবলী গাইতে লাগিলেন। তখন পদ্মাদেবী হতভম্বের ন্যায় ক্ষণকাল দণ্ডায়মানা থাকিয়া জয়দেব পদপ্রান্তে পতিতা হইয়া উচ্চৈস্বরে বলিলেন "প্রভু আমায় ক্ষমা কর, আমি অতি হতভাগিনী, নচেৎ তোমার অগ্রে আহার করিব কেন?" তখন জয়দেব পদ্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন "তোমার সার্থক জীবন, তোমা হইতেই আমি প্রভুর প্রসাদ পাইবার যোগ্য হইলাম, প্রিয়ে তুমি কোন অপরাধ কর নাই, বরং তোমা হইতেই আমি মুক্তি লাভই করিব।

এই ভাবে উভয়ে উভয়ের ভাবে গদগদ হইয়া সেই সচ্চিদানন্দময়কে মন-প্রাণে ডাকিতে লাগিলেন ও বারম্বার বলিতে লাগিলেন "হে দয়াল প্রভো! আমা-দিগকে সংসার যাতনা হইতে মুক্ত করিয়া সতত তোমার লীলাকুঞ্জে স্থান দেন; আমরা নয়ন ভরিয়া তোমার যুগল লীলারূপ দর্শন করি।"

ইহার পর আরও অনেক প্রবাদবাক্য জয়দেব সম্বন্ধে শুনা যায়; তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে হইলে ক্রমে পুস্তকের আকার বৃদ্ধি পায় এই আশঙ্কায় এই পর্য্যন্তই বর্ণিত হইল।

জেলা বীরভূমের অন্তর্গত সর্পী নামক গ্রামে আমাদিগের বর্ত্তমান হেতমপুর রাজের মাতুলালয়, ঐ মাতুল বংশের রাধা মাধব চৌধুরি নামক এক জন প্রধান জমিদার ছিলেন, প্রায় বার্ষিক লক্ষাধিক আয়ের সম্পত্তি তাঁহার ছিল। উক্ত রাধা মাধব চৌধুরি সম্বন্ধে প্রবাদ বাক্য শুনা যায় যে কুন্দা নামক একটী গ্রামে জনৈক সিদ্ধপুরুষ ঘনশ্যাম গোস্বামী তিনি একদা একটী ভগ্নপ্রাচীরে বসিয়া দন্ত ধাবন করিতে ছিলেন এমন সময় তিনি যোগবলে জানিতে পারিলেন যে খোষ্টিকুড়ি নিবাসী খন্দোকার গণ মধ্যে আসতুল্লা নামক জনৈক মুসলমান ফকির তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একটী ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন; তখন ঘন-শ্যাম গোস্বামী যে ভগ্ন প্রাচীরের উপর বসিয়াছিলেন সেই দেওয়াল অর্থাৎ প্রাচীর

সঙ গমন করিয়া মধ্য পথে ফকির আসতুল্লার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি ব্যাঘ্র পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ঘনশ্যাম গোসাই অর্থাৎ গোস্বামী মহোদয়কে সেলাম করতঃ করযোড়ে বলিলেন "আপনার সিদ্ধতা লাভের কথা বহুদিন যাবৎ লোকমুখে শুনিয়া আসিতেছিলাম তাহা পরীক্ষা জন্য অদ্য আপনার নিকট উপস্থিত হইব ইচ্ছা করিয়া আসিতেছিলাম কিন্তু আপনি কি প্রকারে আমার আগমন অবগত হইয়া সাক্ষাৎ জন্য আমার নিকটবর্ত্তী হইলেন ইহাতে আমি বুঝিলাম যে আপনি সাধারণ মনুষ্য নহেন, এবং অস্থাবর অচল জীবহীন দেউল বা কি গুণে চলচ্ছক্তি পাইল ইহাও এক আশ্চর্য্যের কথা, আমি যদিও ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আসিতেছি ইহাত বিশেষ আশ্চর্য্যের ব্যাপার নহে ; কারণ হিংস্রক বহুপ্রাণীকে মনুষ্য আপন বশে আনিয়া ক্রীড়া, কৌতূহল লোক সমাজে দেখাইয়া থাকেন কিন্তু কখনও এমন শুনি নাই যে ঘর, দেওয়াল কাষ্ঠ প্রভৃতি মনুষ্যের আদেশ মত চলিতে পারে ; ইহাতেই অদ্য হইতে আমি আপনার পরম ভক্ত হইলাম। আমাকে আপন ভক্তের মধ্যে গণ্য করিবেন ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

ফকিরের এই প্রকার বাক্যের উত্তরে ঘনশ্যাম গোসাঞী বলিলেন "তুমিও এক জন ভগবানের অসাধারণ ভক্ত তাহা আমি বিশেষভাবে বুঝিয়াছি যে তাঁহার প্রকৃত ভক্ত হইবে তাঁহার নিকট পশুপক্ষী জীবনিচয় সকলই ঈশ্বর শক্তি বলিয়া প্রতীত ও সকল জীবে তাঁহার ভালবাসা প্রকাশিত হইবে এমন কি যে সকল হিংস্রক জীব জন্তু প্রভৃতি ও তাঁহার ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া তাহার বশীভূত হইবে মিয়া সাহেব ইহা নিশ্চয় জানিও। সাধকের কোন প্রার্থনা ভগবান অপূর্ণ রাখেন না ; যাহা হউক অদ্য আপনার মত সাধকের দর্শন পাইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। এক্ষণে আপনার কি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিলে পরমাপ্যায়িত হইব। তখন ফকির সাহেব বলিলেন "আপনি যখন এতদূর ক্লেশ করিয়া আসিয়াছেন, তখন আমার আশ্রম খোষ্টিকুড়ি গ্রামে আপনি পদার্পণ করিলে পরম কৃতার্থ বোধ করিব।

এমতে দুই জনে, কথাবার্ত্তা চলিতে চলিতে অল্প সময় মধ্যে মিয়া আসতুল্লা ফকিরের কুটীরে উপস্থিত হইলে, মিয়া সাহেব স্বীয় ভৃত্য বেলাকে ডাকিয়া বলিলেন একটি বিছানা আমাদের বসার জন্য আনিয়া বিছাইয়া দেও।" ভৃত্য ফকিরের আদেশ মত এক খানি গালিচা আনিয়া বিছাইয়া দিলে, ফকির সাহেব বলিলেন

"গোসাইঁ জি আসন গ্রহণ করুন তখন অগ্রে গোস্বামী মহাশয় আসনে দাঁড়াইয়া আসদুল্লা ফকির সাহেবকে বলিলেন "আপনিও আসনে উপবেশন করুন" ইহা বলিয়াই চিন্তা করিলেন যবন সহ একাসনে কি প্রকারে বসিব ইহা চিন্তা করায় আসন খানি ঐ সঙ্গে সঙ্গেই দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল। অপর খণ্ডে ফকির সাহেব বসিয়া ভৃত্য ও পাচককে ডাকিয়া বলিলেন "যদি খানা প্রস্তুত হইয়া থাকে, তবে আমাদের দুই জনের দুই খানি থালাতে করিয়া আহারীয় লইয়া আইস।

এমতে কিছুক্ষণ পরে পাচক দুই খানি থালায় ফল মূল অন্ন ও সামান্য মাংস ও মৎস্য ভাজা সহ বস্ত্র ঢাকা দুই খানি থালা আনিয়া এক খানি আগন্তুক গোস্বামীর সম্মুখে অপর খানি ফকির মিয়া সাহেবের সম্মুখে দিলে ফকির সাহেব বলিলেন "গোসাইঁ জি এখন আপনার মনে দ্বিধা বর্ত্তমান দেখিতেছি অন্নাদিতে কি হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোন প্রভেদ লক্ষ্য হয়? মনে করুন আপনার ভাত ও আমার ভাত মিশাইয়া দিলে পর কোন ভাত কাহার চেনা যায় কি? ফকিরের এই বাক্য শ্রবণে গোসাইঁ মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন "অবশ্যই প্রভেদ হইতে পারে।" তখন ফকির সাহেব বলিলেন 'বেশ কথা, আমাদের খাদ্য জন্য দুই খানি থালা আনিয়াছে, এক থালা খাদ্য আপনাকে দিয়াছে আর এক থালা আমাকে দিয়াছে ভালই উভয় থালাতেই একই প্রকার খাদ্য আছে, ঢাকা খুলিয়া দেখুন কোন প্রভেদ আছে কি; গোসাইঁ জী বলিলেন 'অবশ্য যাহার যে খাদ্যে রুচি তাহাই তাহার জন্য ঈশ্বর দিয়া থাকেন।'

এই বলিয়া নিজ সম্মুখস্থ থালার আবরণ মোচন করিলে দেখা গেল নানা প্রকার ফলমূল পরিপূর্ণ ও যে কিঞ্চিৎ মাংসাদি ছিল তাহা পুষ্পে পরিণত হইয়াছে আর ফকির সাহেবের থালা খুলিলে যে প্রকার খেচরান্ন ও মাংস ভাজা ছিল তাহা সেই প্রকারই আছে এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ফকির সাহেব বলিলেন "আপন আপন ধর্ম্মাচরণ পৃথকই বটে যাহার যে প্রকার বিশ্বাস, সে সেই ভাবেই চলিলে সেই বিশ্বপতিকে প্রাপ্ত হইবে। মূল উদ্দেশ্য সকলেরই এক, এমতে আহারাদি সমাধা-পূর্ব্বক গোসাইঁ বিদায় লইলেন।

এই প্রকারের অনেক অলৌকিক কার্য্য ঘনশ্যাম গোস্বামীর লোকপরম্পরায় শ্রুত হওয়া যায় তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ লিখিতে হইলে পুস্তক বাড়িয়া যায় এমতে

হনথ্যার গোস্বামীর জীবনী এই পর্য্যন্তই শেষ হইল ; তবে আসহুল্লা ফকিরের বিষয় কিয়ৎপরিমাণে লেখা উচিত বিবেচনায় তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত করিলাম।

উক্ত সৈয়দ সাহ আসহুল্লা সাহেব ফকির, ইহার পিতা সৈয়দ বরখোরদার ; তাঁহার কয়টি পুত্র কন্যা কিছু জানা যায় না ; তবে তাঁহার উক্ত সৈয়দ আসহুল্লা সাহেব সংসার ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া সাহা আরজানী তাঁহার গুরু হন। তাঁহার নিকট শিষ্য হওয়ার পর প্রথমতঃ পদ্মা পার হইয়া কোন স্থানে তিনি কিছুদিন আশ্রম করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তথা হইতে আসিয়া বর্দ্ধমান জেলায় তাঁহার গুরুর সহিত পুনরায় মিলিত হন এবং ঐ জেলার অন্তর্গত বড় গাঁয়ে আস্তানা বাঁধিয়া সেই খানেই গুরুর প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করেন। সেই সময় তাঁহার গুরু তাঁহাকে এই আদেশ করেন যে তোমার স্থায়ী আস্তানা যে স্থানে করিবে তাহার উপদেশ আমি তোমাকে দিতেছি যে তুমি যে যে স্থানে যাইবে, সেই সেই স্থানে প্রাতে যখন দাঁতন করিবে, সেই দাঁতন কাঠিট সেই স্থানে প্রোথিত করিবে এবং তৎপরদিন সেই স্থানে গিয়া দেখিবে যে ঐ দাঁতন কাঠটি অঙ্কুরিত হইয়া পত্রাদি প্রকাশের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ; সেই স্থানেই তুমি স্বীয় আস্তানা অর্থাৎ মোকাম স্থাপন করিবে। এমতে তিনি বহুস্থানে ভ্রমণ করত ঐ প্রকার দাঁতন কাঠ পুঁতিয়া রাখিয়া জেলা বীরভূম খোষ্টকুড়ি গ্রামে উপস্থিত হইয়া এই রূপ গুরু বাক্যানুসারে স্বীয় দন্ত ধাবন করিয়া উক্ত দাঁতন কাঠটি সেই স্থানে প্রোথিত করেন। এমতে তৎপরদিন যাইয়া উক্ত দাঁতন কাঠটি দেখিলেন যে তাহাতে স্থানে স্থানে নূতন শাখা উদ্গমের ন্যায় অঙ্কুর সকল দেখা যাইতেছে ; তদ্দৃষ্টে তিনি অতি আহ্লাদিত হইয়া কিছুদিন উক্ত খোষ্টকুড়ি গ্রামে থাকিয়া যখন দেখিলেন যে ঐ দাঁতন কাঠটিতে শাখাদি প্রস্ফুটিত হইয়া ছোট খাট বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়াছে ; তখন তিনি সেই স্থানে স্বীয় আস্তানা অর্থাৎ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করেন।

আরও জনশ্রুতিতে শুনা যায় যে উক্ত সাহ ফকির সাহাবহুল্লা বাদশাহের ভগ্নীপুত্র ছিলেন উক্ত খোষ্টকুড়ি গ্রামেই তাঁহার চারিটী পুত্রও বসবাস করেন, তাঁহাদের নাম লিখিত হইল :—(১) সৈয়দ সাহ খেতাবুল আর্কিণ (২) সৈয়দ সাহ হোহেসন

(৩) সৈয়দ আলি (৪) সৈয়দ খলিলউল্লা। এই শেষ খলিলউল্লা সাহেব বড়গাঁয়ে বসতি করেন আর সকলের মধ্যে সৈয়দ খেতাবুল আকিন এই খোষ্টিকুড়ি মোকর্ব্বার মত উন্নি নিযুক্ত হন এবং তিনি জীবদ্দশায় সমাধি গ্রহণ করেন। এখন পর্য্যন্ত সেই দাঁতন কাঠি যে বৃক্ষে পরিণত হয় তাহা বর্ত্তমান আছে; এবং উক্ত ফকির সাহা মিয়া সাহেবদের বংশাবলী এক্ষণে কয়েকজন বর্ত্তমান আছেন তৎবিবরণ লিখিলে পুস্তক বাড়িয়া যায় মতে প্রধান যিনি এক্ষণে ঐ গদিতে আছেন তাঁহার নাম সৈদ সাহা আবদুর রহমান আবু আহাম্মদ সাহেব ইনি বর্ত্তমান আছেন। উল্লিখিত দাঁতন কাঠি হইতে যে বৃক্ষটী উৎপন্ন হইয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান তাহার গণনা সংখ্যায় ৪০০ চারি শত বৎসর হইতেছে।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত মঙ্গলডি গ্রামে

পর্ণগোপাল সিদ্ধ পুরুষের বিবরণ।

—০:০:—

পর্ণ গোপালের পাঁচ পুত্র যথা হরিহর দ্বিতীয় কিশোর, তৃতীয় পুত্র অনন্ত চতুর্থ কানুরাম পঞ্চম লক্ষ্মণ। ইহাঁদের মধ্যে অনন্ত নামক গোস্বামী খয়রাসুলে বাস করেন। তাঁহাদের বংশাবলী মধ্যে এক্ষণে যে যে আছেন, তাঁহারা অদ্যাবধি তথা-কার গোপাল বিগ্রহের সেবাদি চালাইয়া সেবাইত রূপে রহিয়াছেন। কার্ত্তিক মাসে গোষ্টাষ্টমীতে তথায় অদ্যাপি গোষ্টমেলা হইয়া থাকে।

উক্ত আদি মঙ্গলডি গ্রামে পর্ণ গোপালের স্থাপিত যুগল রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি ও গোপাল দেবাদির সেবা আছে। অদ্যাপিও তাঁহাদের বংশাবলী মধ্যে প্রতাপচন্দ্র গোস্বামী ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র হরিকিঙ্কর ঠাকুর বর্ত্তমান আছেন। তিনি সম্প্রতি হেতমপুর রাজষ্টেটের প্রধান ম্যানেজার পদে থাকায়, উক্ত মঙ্গলডি গ্রামের অবস্থা অতীব শোচনীয়; কারণ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই প্রায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং ভগবত প্রেমে মুগ্ধ ও বিদ্যোৎসাহী। এমন কি বহু দেশ বিদেশের ছাত্রগণ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য তাঁহাদের বৃহৎ টোলে শিক্ষিত হইতেন। লোকমুখে শুনা যায়

প্রায় এক শতের অধিক শিক্ষার্থিগণ উক্ত টোলে শিক্ষা লাভ করিত এবং উল্লিখিত দেবসেবার অন্নপ্রসাদ হইতে তাঁহাদের আহারের সংস্থান হইত।

প্রশংসিত গোস্বামী ঠাকুর বংশের জগদানন্দ গোস্বামী ঠাকুর বিদ্বান ছিলেন এবং তিনি একখানি শ্যামবিলাস নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহাদের বংশের প্রতাপচন্দ্র ঠাকুরের পুত্র শ্রীযুক্ত হরিকিঙ্কর ঠাকুর মহাশয়ও বিদ্বান ও পরমধার্ম্মিক; কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি বিদ্বান ও ধর্ম্মানুরাগী হইয়া কেন যে স্বীয় গ্রামের উন্নতি কল্পে বাটীতে একটী সংস্কৃত অধ্যয়নোপযুক্ত টোল এ যাবৎ স্থাপিত করেন নাই ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে, কারণ দেবসেবারও যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, উপরন্তু তিনি নিজে সুবৃহৎ হেতমপুর রাজষ্টেটের ম্যানেজার পদে থাকিয়াও যথেষ্ট ধন অর্জ্জন করিতেছেন; এমত অবস্থায় স্বীয় গ্রামের এরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটা অসম্ভব।

উক্ত পর্ণগোপাল সম্বন্ধে অনেক জানিবার বিষয় আছে তাঁহাদের বিশেষ কুলনামা ও যিনি যে প্রকার স্বভাবের মনুষ্য ছিলেন তৎবিবরণ লিখিতে হইলে বড় জীবনী লিখিতে হয় ও পুস্তক অধিক বড় আকার ধারণ করিবে আশঙ্কায় এই তৎসামান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইল।

সম্প্রতি উচ্চ বংশের কৃতী সন্তান শ্রীযুত হরিকিঙ্কর ঠাকুর মহোদয় কয়েক খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত "বরাটিকা" পুস্তক খানিতে কৃষ্ণ বিষয়ক কীর্ত্তন বর্ণিত আছে।

জগদানন্দ গোস্বামীর বিবরণ।

—:০:০:—

জগদানন্দ সম্ভবত ১৬২৫ কি ১৬২৬ শকে বর্দ্ধমান শ্রীখণ্ড গ্রামে বৈষ্ণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নিত্যানন্দ গোস্বামী, পিতামহের নাম পরমানন্দ, ও জগদানন্দের তিন সহোদরের নাম (১) সর্ব্বানন্দ (২) কৃষ্ণানন্দ (৩) সচ্চিদানন্দ কিন্তু জগদানন্দ ভ্রাতৃগণ হইতে পৃথক হইয়া বীরভূম অন্তর্গত যোফলাই গ্রামে বসবাস করেন। উক্ত যোফলাই গ্রাম দুবরাজপুরের থানা সামীল। ঐ জগদানন্দ একদা নিদ্রা

যাইয়া স্বপ্নে গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন করেন। তদপর উক্ত যোফলাই গ্রামেই গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি স্থাপন করত এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং সেবার জন্য বিশেষ জমি লাখরাজ আদি উক্ত দেবের সেবা নির্ব্বাহের জন্য দান করেন। সন ১১০৪ শকে অর্থাৎ ১৯৮২ খৃষ্টাব্দে ৫ই আশ্বিন তারিখে উক্ত যোফলাই গ্রামেই তাঁহার লোকান্তর হয়। অদ্যাবধি সেই দিনে যোফলাই গ্রামে মহামেলা ও মহোৎসবাদি হইয়া থাকে।

পাণ্ডবেশ্বর ও ভীমগড়ের বর্ণনা।

উক্ত পাণ্ডবেশ্বর শিবলিঙ্গ পাণ্ডবগণের স্থাপিত; পাণ্ডবেশ্বরে একটী শিবলিঙ্গ নহে, দ্রৌপদীশ্বর প্রভৃতি পাঁচটী পঞ্চ পাণ্ডবের দ্বারা স্থাপিত; এই জন্যই মূল নাম পাণ্ডবেশ্বর নামেই অভিহিত। মন্দির একটী নয় পুরাকালে অবশ্যই একটী বৃহৎ মন্দিরই ছিল, কিন্তু দুই তিন শত বৎসর মধ্যে আরও কয়েকটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানটী অতি মনোরম, তিন দিকে নিবিড় শাল, পিয়াল, অর্জ্জুন প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণীতে পরিব্যাপ্ত, এক দিকে অজয় এই ইহার চতুঃসীমা হইল। ইহার অর্দ্ধ ক্রোশের মধ্যে লোকালয় দৃষ্টিগোচর হয় না। স্থানটী এত সুন্দর এত নির্জ্জন যে, যে একবার পাণ্ডবেশ্বর দেখিয়াছে সে কখনও তাহা ভুলিতে পারে না। সেখানে গেলে সেই বনরাজি বৃক্ষোপরে যে সকল পাখীরা গান করিতে থাকে, তাহা এত শ্রুতিমধুর বোধ হয় যে অন্য পল্লীস্থ জঙ্গলে তদ্রূপ মধুরধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় না ইহার কারণ এই যে এস্থানের তিন দিক বনরাজিপূর্ণ, অপর দিকে স্রোতস্বতী অজয় ও তাহা মরু বালুকাপূর্ণ, শ্মশানবৎ জন বিহীন স্থল ও জন কোলাহলশূন্য নিস্তব্ধ স্থান বলিয়া তথাকার পক্ষীগণের সুমধুর গীত সুস্পষ্ট শ্রুতিমূলে আরও সুমধুর বলিয়া অনুমিত হয়। পাণ্ডবেশ্বরের পদ ধৌত করিয়া কল কল নাদে অজয় প্রবাহিত, পর পারে সুদূর বিস্তৃত স্থল বালুকারাশি, তাহার পশ্চাতে তৃণহীন কঙ্করাকীর্ণ প্রান্তর, প্রান্তরের পিছনে আকাশ ও আকাশের গায়ে ধূসরবর্ণ ভীমকায় শৈলচূড়া,

আকাশের সংলগ্ন পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিয়া ও গগনস্পর্শী অনন্ত বিস্তৃত বিটপীর শ্যামল বর্ণের সহিত ক্ষুদ্র মন্দিরচূড়া ও আকাশের ছবি পৃথিবীতে প্রতিবিম্বিত হইয়া অতীব লোকমুগ্ধকর দৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সেই সময় দর্শকগণের মনোভাব ভক্তি মার্গে অনুধাবিত হইয়া এইরূপ ধারণা হয় যে আকাশের দেবতা মন্দিরস্থ হইয়া ভক্ত দর্শকগণকে যেন আহ্বান করিতেছেন।

বনবাসকালে পাণ্ডবেরা যে ঐ প্রদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন তাহার আরও কতক নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয়। পাণ্ডবেশ্বরের ঠিক সম্মুখে অজয় নদীর পরপারে এক খানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে ঐ গ্রামের নাম ভীমগড়া শুনিতে পাওয়া যায়। এখানে ভীমের কৃত গড় ছিল, কিন্তু এখানে তাহার বিশেষ কোন চিহ্ন দেখা যায় না কেবল মাত্র একটী প্রাচীন শিবমন্দির আছে, উক্ত মন্দিরের নাম ভীমেশ্বর। মন্দিরটির আকার প্রকার দেখিয়া যে প্রকার ক্ষুদ্র ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির, বহু প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। তবে মন্দিরের উপস্থিত আকার দেখিয়া পাণ্ডবেশ্বর ও ভীমেশ্বর মন্দির যে একই সময়ে নির্ম্মিত এরূপ বুঝা যায় না, তবে হইতে পারে বারম্বার সংস্কার করা হেতু তাহার উপস্থিত অবস্থা তত প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয় না।

পাণ্ডবেশ্বরের মন্দির যে বহুকালের ইহা অদ্যাপিও অনুমিত হয় এবং জন-শ্রুতিতে প্রবাদ এই যে সাত শত বৎসর পূর্ব্বে ধ্রুব নামক এক গোস্বামী উক্ত মন্দি-রের সংলগ্ন একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় সময় সময় থাকিতেন। তিনি যখন তীর্থাদি ভ্রমণে স্থানান্তরে যাইতেন তখন মন্দিরে পূজাদির ভার অন্য এক জন সন্ন্যাসীকে অর্পণ করিয়া যাইতেন, সেই সন্ন্যাসীর জাতি, কুল কি বাসস্থান কোথায় তাহার কোন পরিচয় জনশ্রুতিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে আরও জন শ্রুতি প্রবাদ বাক্যে জানা যায় যে উক্ত সন্ন্যাসী ঠাকুর ধ্রুব গোস্বামী শ্মশানে হোমাদি ও জপাদি করিতেন, এবং তিনি দীর্ঘকায় ও অতি বলিষ্ঠ বীরপুরুষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অনেকের মুখে শুনা যায় যে তিনি শক্তিমন্ত্রের উপাসক ছিলেন এবং তাঁহার কার্য্য কলাপ সাধারণের দেখিয়া তাহাই অনুমান করিতেন এইরূপ জনশ্রুতিতে জানা যায়।

ভাণ্ডীবনের বিবরণ।

—:•:•:—

বীরসিংহপুরের অর্থাৎ রাজা বীরসিংহের রাজধানীর কিঞ্চিৎ ন্যূন এক মাইল পূর্ব্বে ভাণ্ডীবন অবস্থিত। হণ্টার সাহেব নিজ পুস্তকে ভাণ্ডীবনকে বৃন্দাবন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এস্থানকে ঠিক বৃন্দাবন বলে না বা ইহার নিকট কোন গ্রাম বৃন্দাবন নামে দৃষ্টিগোচর হয় না তবে কেন হণ্টার সাহেবের এরূপ ভ্রম ইহার কারণ ইহাই অনুমিত হয় যে, যে সময় হণ্টার সাহেব এই স্থান দেখিতে আসিয়াছিলেন, তথাকার জন সাধারণকে জিজ্ঞাসা করায় বোধ হয় স্থানীয় লোকে তাঁহাকে বলিয়াছিল এই স্থানটী বৃন্দাবনের সদৃশ। তাহাই শুনিয়া হণ্টার সাহেব ইহাকে বৃন্দাবন উল্লেখ করিয়া থাকিবেন, এবং এই ভাণ্ডীবনের আকৃতি প্রকৃতি গঠন দৃষ্টে বোধ হয় যে এ স্থানটী বৃন্দাবনের অনুকরণেই কতক নির্ম্মিত। ভাণ্ডীবন দেখিতে অতি সুন্দর। এরূপ মনোরম স্থান এঅঞ্চলে অতি বিরল, এই ভাণ্ডীবন আয়তনে কম নহে এবং বৃক্ষ লতা গুল্মাদি পরিবেষ্টিত এখানে রাধাকুণ্ড আছে. এই কুঞ্জে কদম্ব বৃক্ষ আছে, দোলমঞ্চ আছে, রাসমঞ্চ আছে, কিন্তু নাই কেবল প্রবাহিত যমুনার কলধ্বনি আর গোপিকাগণ। পুলিন আছে, পুলিনে গ্রাম্য রাখালগণ গোচারণ করিয়া থাকে। এখানে গোপাল দেবের মন্দিরটী বৃহৎ এবং এ স্থানের প্রধান বিগ্রহ গোপালই প্রতিষ্ঠিত। ইহা ছাড়া অন্যান্য অনেক ঠাকুর আছেন তাঁহাদের নাম প্রকাশিত নহে কেবল গোপাল জীউর নামই খ্যাত। তাহার চতুর্দ্দিকে আরও ছোট ছোট বহু দেব মন্দির আছে, ঐ সকল দেব মন্দির উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত দেউলের বাহিরে দরজার সংলগ্ন অতি বৃহৎ অতিথিশালা, পশ্চিমে ভোগ মন্দির, উত্তরে পূজক ও সাধকগণের বসবাস যোগ্য বহু কুটীর সকল ইষ্টক নির্ম্মিত অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে; কেবল নাই সেরূপ ভক্তিমান সাধক। এ স্থানটী যদিও বৃন্দাবনের সমতুল্য না হউক, কিন্তু দৃশ্যে তৎতুল্য অনেকটা বটে, এ স্থানটী দেখিলে ভক্তিরসে মনোপ্রাণ আপ্লুত হইতে থাকে। ভক্ত সাধকগণের মনোতৃপ্তিকর স্থান

বলিয়া অনুমিত হয়। বীরসিংহপুর গ্রামের অর্থাৎ বীরসিংহের রাজধানীর কিয়দ্দূরে স্রোতস্বতী মৌরাক্ষী নদী কলকল নাদে প্রবাহিত তদ্দৃষ্টে এ স্থানটী অতি চিত্ত মুগ্ধকর।

বীরভূম পীঠস্থানে কয়েকটী সাধকের বিবরণ।

—•:•:—

পরম তীর্থ বক্রেশ্বরে ন্যাংটা খাকি বাবা নামে এক জন সাধু পুরুষ প্রায় থাকেন। তিনি যে কত দিনের লোক এবং তাঁহার বয়স কত তাহা কেহ ঠিক বলিতে পারে না; তবে অনুমানে তাঁহার বয়ঃক্রম শতাধিক বলিয়া অনুমিত হয়। আমি ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, এক্ষণেও তিনি প্রায় সেইরূপ সবল শরীরে আছেন কোন বিশেষ পার্থক্য ঘটে নাই। দেহ সবল চক্ষু জ্যোতিবিশিষ্ট ও কর্ম্মঠ বলিয়া পরিলক্ষিত হয়; এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপে ভক্তিরসেরই উদয় হইয়া থাকে। আরও উক্ত স্থানে উড়িষ্যা দেশীয় জনৈক কাপালীক সাধক থাকেন।

তারাপুর মহাপীঠে বামা ক্ষেপা নামক একটী পরম সাধু ছিলেন। তাঁহার অবয়ব দেখিলে বোধ হইত যেন তিনি সাক্ষাৎ ভৈরব মূর্ত্তি, তিনি বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন না, তাঁহার লম্বোদর এরূপভাবে নামিয়া পড়িয়াছিল যে তদ্দারা পুরুষচিহ্ন গোপনীয় স্থান একবারে ঢাকা পড়িয়াছিল। তিনি উপবেশন করিলে উলঙ্গ কিনা তাহা বুঝিতে পারা যাইত না এবং দিবারাত্রি তিনি অপর্য্যাপ্ত মদিরাসুধা পান করিলেও তাঁহার জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর হইত না এবং নীলতন্ত্রে উক্ত আছে কলির মধ্য সময়ে বামা নামক ভৈরব জন্ম গ্রহণ করিয়া পরম সাধক বশিষ্ট মুনির তপস্যা স্থানে যে শিমুল বৃক্ষটী আছে, তাহা ধ্বংস করিবেন। এবং উক্ত পীঠ স্থানের পূর্ব্ব মাহাত্ম্যের অনেকটা হ্রাস হইবে। তাহাও ক্রমে ঘটিয়াছে কেননা এক্ষণে সে শিমুল বৃক্ষের আর কোন চিহ্ন নাই।

অত্র বীরভূম মধ্যে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর এক জন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন তাঁহার জীবনী বহু পুস্তকে বাহির হইয়াছে এবং বিল্বমঙ্গল নাটকাদিও বাহির হইয়াছে সেই নিমিত্ত তৎবিবরণ আর পুনঃ প্রকাশের আবশ্যক বোধ করিলাম না।

বীরভূমের বর্ত্তমান রাজা, জমিদারের বংশ পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জন্ম ১২২৭ সালে। কেহ কেহ বলেন ১২৩৩ সালে তাঁহার জন্ম। ইনি মোটে ৪১ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন; সন ১২৬৮ সালে তাঁহার পরলোক হয়। তাঁহার পুত্র বর্ত্তমান হেতমপুরাধিপতি রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর। ইহাঁর জন্ম ১২৫৭ সালের ৭ই ফাল্গুন। রাজা বাহাদুর যখন এগার বৎসর কয়েক মাসের মাত্র বালক তখন তাঁহার পিতা কৃষ্ণচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন। সেই সময় নাবালকের যাবতীয় সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন হয়। তৎপরে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বোর্ডের আদেশ মত নাবালকের সমস্ত স্থাবর অস্থাবর বস্তু কালেক্টার সাহেব বাহাদুর নাবালক রামরঞ্জন মহোদয়কে বুঝাইয়া দেন। ইং ১৮৭৭ সালে ইনি রাজা বাহাদুর উপাধিতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূষিত হন। উক্ত রাজা বাহাদুরের নাবালক অবস্থাতেই দাঁড়কা গ্রাম নিবাসী কালাচাঁদ রায়ের কন্যা পদ্মাসুন্দরী দেবীর সহিত বিবাহ হয়। ইনি ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে রাজা ও ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন।

রাজা বাহাদুর ক্রমে স্বীয় বুদ্ধি তীক্ষ্ণতা হেতু বহু জমিদারী বাড়াইয়া ও নগদ টাকা ব্যাঙ্ক সকলে জমা দিয়া এ পর্য্যন্ত সবল দেহে পুত্র পৌত্র পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবৎকৃপায় খুব স্বচ্ছন্দে রাজ্যভোগ করিতেছেন। এমন অদৃষ্টবান লোক সংসারে অতি অল্প মাত্রই পরিদৃষ্ট হয়। পূর্ব্বাপর সকল কথা লিখিতে গেলে পুস্তকের আকার বাড়িয়া যাইবে আশঙ্কায় সংক্ষেপে তাঁহার বংশের কুর্শী নামা সহ তাঁহাদের পরিচয় শেষ করিলাম।

বোলপুর থানার অধীন রাইপুর গ্রাম নিবাসী

প্রধান জমিদার বংশের পরিচয়।

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলোদ্ভব বাংখ গোত্রজ সিংহ পরিবার মধ্যে শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সিংহ ১৮৬৩ খৃঃ ২৪ মার্চ্চ বাঙ্গালা ১২৬৯ সালের ১৩ই চৈত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই সিংহ পরিবারবর্গ বীরভূম জেলার মধ্যে প্রতিভা গৌরবে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। ইহাঁরা জ্যেষ্ঠ গদাধরের সন্তান। যদিও ইহাঁরা কুলীন নহেন তথাপি উক্ত রাঢ়ীয় কায়স্থ গণের মধ্যে প্রায় যাবতীয় কুলীন ঘরই সিংহ পরিবারের সহিত আদান প্রদান সম্বন্ধবদ্ধ।

বহুকাল পূর্ব্বে আদি বাসস্থান মুর্শীদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দী গ্রাম ত্যাগ করিয়া এই পরিবারের কোন পূর্ব্বপুরুষ মেদিনীপুর জেলার অধীন চন্দ্রকোণা গ্রামে বাস স্থাপন করেন। এই স্থানে সিংহ দীঘি নামে একটী দীঘি, বৃহৎ পুষ্করিণী ও ভগ্নাবশিষ্ট অট্টালিকা অদ্যাবধি পরিলক্ষিত হয়। এই চন্দ্রকোণা গ্রামে তাঁহাদের কত কাল বাস তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

এদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অভ্যুদয় কালে উক্ত পরিবারভুক্ত লালচাঁদ সিংহ চন্দ্রকোণার বাস ত্যাগ করিয়া তদ্দেশীয় প্রায় এক সহস্র তন্তুবায় সহ রাইপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

এই তন্তুবায়গণ হস্ত শিল্পের দ্বারা কাপড় প্রস্তুত করিত। এই সকল কাপড় তিনি রাইপুর সন্নিকটস্থ সুরুল নামক গ্রামে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ম্যানেজার চীক্ সাহেবের নিকট বিক্রয় করিতেন। বীরভূম তখন নগরের ফৌজদার বা রাজ শাসনাধীনে ছিল। উক্ত চীক্ সাহেবের কুঠি এখনও সুরুল গ্রামে বর্ত্তমান আছে। চীক্ সাহেবের স্মৃতিরক্ষার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট তথায় এক খোদিত প্রস্তর ফলক স্থাপিত করিয়াছেন।

লালচাঁদের পুত্র শ্যাম কিশোর এই কাপড়ের ব্যবসায়ে সমূহ উন্নতিলাভ করেন। প্রবাদ আছে প্রত্যহ সহস্র তন্তুবায়ের নিকট কাপড় খরিদ এবং তৎসমুদয় ইংরাজ

বণিকগণকে বিক্রয় করিয়া প্রত্যহ সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেন। এইরূপে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া বীরভূমের ফৌজদার নগরের রাজার নিকট হইতে সমগ্র সেনভূম পরগণার জমীদারী স্বত্ব খরিদ করেন। সেই অবধি সেনভূম পরগণা এখনও সিংহ পরিবারের সম্পত্তি। ইহার বার্ষিক আয় এক লক্ষের উপর হইবে।

রাইপুরের সিংহ পরিবারের এখন যে প্রকাণ্ড প্রাচীর বেষ্টিত চৌতল বাড়ী বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা শ্যাম কিশোর সিংহ অনুমান ১৭৮৪ খ্রীঃ নির্ম্মাণ করেন। প্রাচীর মধ্যে প্রকাণ্ড বাড়ী, দেবমন্দির, বৈঠকখানা, অন্দর মহল, বড় বড় পুষ্করিণী এই সকলে অনুমান ৬০।৭০ বিঘা স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই বাড়ীর আয়তন সম্বন্ধে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, এই বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার শতবর্ষ ধরিয়া এই বাড়ীতে বাস করিলেও এখন পর্য্যন্ত স্থানের অকুলান হয় নাই। দূর হইতে এই প্রাচীর বেষ্টিত বাড়ীটি একটী ছোট দুর্গ বলিয়া মনে হয়। ইহার জল নিকাশের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর।

শ্যামকিশোরের তিন পুত্র জগমোহন, ভুবনমোহন ও মনোমোহন। ইহাঁদের বংশধরগণ এখন যথাক্রমে পহেলা, দোসরা ও তেসরা নম্বরের বাবু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। জগমোহনের বিষয় বুদ্ধি যথেষ্ট ছিল, তিনি জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিয়া অনেক উন্নতি করেন। কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বীরভূমের কালেক্টারী তৌজীতে ইহারই নামে সিংহ পরিবারের যাবতীয় সম্পত্তির নামজারী প্রচলিত ছিল।

ভুবন মোহনের দুই পুত্র ও এক কন্যা জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপ নারায়ণ সিংহ বহুকাল যাবৎ বাঁকুড়া জেলায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়া ছিলেন। তিনি অতি সুপণ্ডিত ও ধর্ম্মপরায়ণ থাকায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। সেইজন্য প্রতাপ বাবু ও তাহার খুল্লতাত পুত্র শ্রীকণ্ঠ বাবুর বন্ধুত্ব ও প্রীতির আকর্ষণেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রতাপ বাবু পিতৃ নামে খ্যাত ভুবনডাঙ্গা নামক স্থানটি শান্তি নিকেতন নির্ম্মাণ জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দান করেন। এইরূপে তথায় সেই স্থানে শান্তি নিকেতন স্থাপিত হয়।

সাহিত্যসেবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভুবনডাঙ্গায় ব্রহ্ম বিদ্যালয় স্থাপন করতঃ অধি-

কালে সময়ই তথায় বাস করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অন্যান্য ঠাকুরবর্গ প্রায় অনেক সময় এই স্থানে থাকেন। সেইজন্য উক্ত সিংহ পরিবারের সহিত প্রশংসিত ঠাকুরবর্গের বিশেষ আত্মীয়তা।

উক্ত প্রতাপ নারায়ণ সিংহ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রায় চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম, এ, বহুকাল যাবৎ সুখ্যাতির সহিত গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়া শেষে কলিকাতার ষ্ট্যাম্প কালেক্টার ও এক্সসাইজ কালেক্টার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করিয়া পরে অবসর গ্রহণ করেন। প্রতাপ নারায়ণ সিংহের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ, মহাশয় "প্রেম" প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া সাহিত্য সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

বাবু মনোমোহন সিংহের তিন পুত্র। নীলকণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠ ও শীতিকণ্ঠ। নীলকণ্ঠের পুত্র রুদ্রপ্রসন্ন। ইনি গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগে কার্য্য করিতেন। ইঁহার পুত্র শ্রীযুত সজনীকান্ত কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রীকণ্ঠের পুত্র সন্তান ছিল না।

শ্রীযুত সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ মনোমোহন বাবুর পৌত্র ও শীতিকণ্ঠ সিংহ মহাশয়ের পুত্র। সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহের প্রতিভাগৌরবে ভারতবাসী মুগ্ধ, বিস্মিত। সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ অতিশয় ধর্ম্মভীরু, ন্যায়বান, সত্যবাদী ও নির্ম্মল চরিত্র পুরুষ।

ইনি প্রথমতঃ সিবিলিয়ান হইয়া হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার পদে নিযুক্ত হন। পরে ১৯০৬ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসে অস্থায়ী ভাবে এডভোকেট জেনেরেলের পদ প্রাপ্ত হয়েন।

পরে ১৯০৮ খৃঃ অব্দে জুন মাসে উক্ত পদে পাকা হয়েন। তদনন্তর তিনি এই পদ হইতে ভারত সম্রাট কর্ত্তৃক গভর্ণর জেনারেলের ল-মেম্বর বা ব্যবস্থা সচিবের সমুচ্চ পদে সমাসীন হন। কোন ভারতবাসী এরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হন নাই।

রমাপ্রসন্ন সিংহের চারি পুত্র। ১ম চারুচন্দ্র সিংহ বি, এল কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল। সম্প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর লিগ্যাল এডভাইসার পদে অধিষ্ঠিত। ২য় পুত্র শ্রীমান প্রফুল্ল চন্দ্র সিংহ হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার; ইনি বিলাতে অবস্থান করিতেছেন। রমাপ্রসন্ন ও সত্যেন্দ্র প্রসন্নের অগ্রজ নরেন্দ্র প্রসন্ন এল, এম, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তদনন্তর তিনি স্বগ্রামে কিছুদিন

চিকিৎসা আরম্ভ করেন ; পরে ১৮৮০ খৃঃ অব্দে ভ্রাতা সত্য প্রসন্নের সহিত বিলাত যাত্রা করেন এবং সেখান হইতে এল, এম, এস উপাধি লাভ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। ১৯০৫ খৃঃ অব্দে কার্য্য ত্যাগ করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান মহিম সিংহ লণ্ডন ইউনিভারসিটীতে অধ্যয়ন করিতেছেন। সত্যেন্দ্র প্রসন্ন ইংলণ্ড যাইবার পূর্ব্বে ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মাহাতা গ্রাম নিবাসী জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র মিত্রের কন্যা শ্রীমতী গোবিন্দ মোহিনী দাসীর পাণিগ্রহণ করেন। উক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র মহাশয় মাহাতা গ্রামের প্রধান এবং জমিদার। সত্যেন্দ্র প্রসন্নের ন্যায় তাঁহার সহধর্ম্মিণী গোবিন্দ মোহিনী দাসীরও চিত্ত নির্ম্মল ; তিনি সতী। যদিও তিনি আধুনিক ধরণের বিদুষী নহেন তথাপি তিনি পরিবারবর্গের সহিত কিভাবে মিলে মিশে থাকিতে হয়, কি ভাবে স্বামী সন্তানগণের যত্ন করিতে হয় তাহা তিনি বেশ জানেন। এসব বিষয়ে তিনি সমাজ মধ্যে আদর্শ রমণী। কোমলহৃদয়, দয়া দাক্ষিণ্য গুণে গুণবতী এবং অহঙ্কার শূন্য অমায়িক ভাবাপন্ন রমণীগণ মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ। ইহাঁর মত রমণী সংসারে অতি বিরল।

"রাজা নন্দকুমারের বিবরণ।"

—:০:০:—

বীরভূমের অন্তর্গত ভদ্রপুর গ্রামে মহারাজ নন্দকুমারের রাজধানী। মহারাজ নন্দকুমার রাজনীতিজ্ঞ ও জ্ঞানবান প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে ইং ১৭৭০ খৃঃ অব্দে, বাঙ্গালায় যখন বিষম দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, সেই সময় বাঙ্গালার নায়েব দেওয়ান অর্থাৎ নায়েব নাজিম পদে মহম্মদ রেজা খাঁ অধিষ্ঠিত। তখন রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য তাঁহার আদেশে নির্ব্বাহ হইত কারণ সে সময় জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত ডাহাপাড়ার মহারাজ দর্পনারায়ণ রায় প্রধান কাননগো মহাশয়ের বংশধর লক্ষ্মীনারায়ণ রায় মহাশয় তৎকালীন লর্ড ক্লাইবের সহিত বাঙ্গালার নবাব অর্থাৎ সুবাদার মির্জ্জাফরের যে সন্ধিপত্র অর্থাৎ সনন্দ লিখিত হয়

তাঁহার শিরোভাগের বামভাগে মির্জ্জাফর খাঁ বাহাদুরের মোহর সহি ও তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে রাজা দুর্লভ রায় বাহাদুরের মোহরসহি। ঐ মোহর সহির বামপার্শ্বে প্রধান কাননগো রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় মহাশয় সাক্ষী স্বরূপে দস্তখত করেন ও দক্ষিণ পার্শ্বে মহারাজ রাজ বল্লভের পুত্র মহেন্দ্র নারায়ণ কাননগো সাক্ষী স্বরূপে দস্তখত করেন। উক্ত সন্ধিপত্র ১৭৫৭ খৃঃ সম্পাদিত হয়। ইহার অল্পকাল পরেই প্রধান কাননগো রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় মহাশয় পরলোক গমন করেন; তাঁহার পুত্র সূর্য্য নারায়ণ রায় মহাশয় তখন নাবালক, উক্ত ষ্টেটের একজিকিউটার পদে মৃত লক্ষ্মী নারায়ণ রায় মহাশয়ের স্বজাতি ও আত্মীয় কাঁন্দি নিবাসী গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নিযুক্ত থাকেন, সেই সময়ে মুর্শিদাবাদ ডাহাপাড়ার রাজা প্রধান কাননগোর পুত্র নাবালক থাকায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকার কালে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বৃটিশ পক্ষ হইতে নিযুক্ত হন, সেই অবধি গঙ্গাগোবিন্দ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ নামে পরিচিত; সেই সময়েই মহম্মদ রেজা খাঁ নবাব মির্জ্জাফরের নায়েব দেওয়ান অর্থাৎ রাজস্ব সচিবের পদে নিযুক্ত হন; তৎকালীন ভদ্রপুর নিবাসী মহারাজ নন্দকুমার নবাব মির্জ্জাফরের প্রিয় পাত্র হন। পরে লর্ড হেষ্টিংস ১৭৭২ খৃঃ গবর্ণর পদে নিযুক্ত হইলে তৎসমীপে মহারাজ নন্দকুমার বিশেষ পরিচিত হন। তৎপরে ১৭৭৫ খৃঃ লর্ড হেষ্টিংস গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর প্রশংসিত মহারাজ নন্দকুমারের উপর কোন কারণ বশতঃ বিরক্ত হন; সে সমস্ত বিস্তারিত বিবরণ অন্যান্য ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে অতএব ঐ বিবরণ লেখা বাহুল্য মাত্র।

কিয়দ্দিবস পরে মুর্শিদাবাদ রাজধানীতে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার সুবার পদে তখন নাম মাত্র সুবা মুবারকোদ্দৌলা ছিলেন, তিনিও মহারাজ নন্দকুমারকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন. এমন কি বোলাকীদাসের অঙ্গীকার পত্রের জালের মোকদ্দমায় মহারাজ নন্দকুমারের মঙ্গল কামনায় বিশেষ চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার প্রতি তখন ভগবান প্রতিকুল থাকায় কোন সুফল হয় নাই; এমন কি কালগতিকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা জগৎ চাঁদ বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের কুঞ্জঘাটার কুমারের বংশাবলীর একজন; ইনিও শ্বশুরের বিরুদ্ধে যোগদানে ক্রটী করেন নাই।

এক্ষণে ভদ্রপুর রাজধানীতে কেবল মাত্র মহারাজ নন্দকুমারের ভগ্ন অট্টালিকা ও পুষ্করিণীর চিহ্নমাত্র রহিয়াছে। পূর্ব্বে নন্দকুমার বহু ভদ্র লোকের বসবাস করান বলিয়া উক্ত স্থান ভদ্রপুর নামে খ্যাত।

হেতমপুরের সামিল গ্রাম সমূহে

উচ্চপদস্থ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের বিবরণ।

একদা এই জেলার অন্তর্গত হেতমপুর গ্রাম, আসদগঞ্জ ও বরকতিপুর এই রূপ কতকগুলি গ্রাম হেতমপুর গ্রামে সংলগ্ন। পূর্ব্বে রাজনগরাধিপতির রাজকুমার আলিনকী খাঁ উক্ত হেতমপুর গ্রামে হাপেজ খাঁর মৃত্যুর পর তদ্দুর্গ অধিকার করিয়া তাঁহার দেওয়ান সেনাপতি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ বাঁকা দীপ চাঁদ সরকারের হস্তে দুর্গভার সমর্পণ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। সেই সময় দুর্গাধিপতি বাঁকচাঁদ সরকারের যত্নে আসদ খাঁ ও বরকত খাঁ উক্ত হেতমপুরের চতুষ্পার্শ্ব জঙ্গল ভূমি কর্ত্তন করিয়া কতকগুলি গ্রামাদি স্থাপন করেন। সেই সময় হইতেই আসদ খাঁর ও বরকত খাঁর নামানুসারে গ্রাম গুলির নাম আসদগঞ্জ ও বরকতিপুর হইয়াছে। ঐ সকল গ্রাম জরিপ ও কুমাবন্দী বন্দোবস্ত করিবার জন্য উক্ত নগরাধিপতির রাজস্ব সচিব উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সীতারাম ঘোষ ঐ সকল বন্দোবস্ত কার্য্য সমাধা করেন। উক্ত সীতারাম ঘোষের সঙ্গে আরও অনেক গুলি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ বসবাস করেন। তৎসময় রাজকুমার আসদ খাঁ বাহাদুর সীতারাম ঘোষের বন্দোবস্ত কার্য্যে সন্তোষলাভ করিয়া সীতারামের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে তুমি সম্পত্তি বৃদ্ধি করনরূপ সন্তোষ জনক কার্য্য করিয়াছ তাহার পুরস্কার স্বরূপ যাহা প্রার্থনা করিবে তাহা আমি পূরণ করিব। তখন সীতারাম ঘোষ বহু অর্থ বা বহু গ্রাম প্রার্থনা করিলেও পাইতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি নিজে যে গ্রামে বসবাস করিতেন এবং অপরাপর স্বজাতিকে বসবাস করিয়াছিলেন, কেবলমাত্র সেই গ্রামটিকে পুরস্কার স্বরূপে প্রার্থনা করিলেন। রাজকুমার তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রার্থনা পূরণ সীতারামের নামযোগে

লাখরাজ সীতারামপুর নামে সনন্দ প্রদান করিলেন; তদবধি তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ক্রমেই ঐ গ্রামে ভোগ দখল করিতে থাকেন। পরে আমাদের বৃটিশ রাজের অধিকার কালে উক্ত সীতারামপুর দৈয়ম খালাসি লাখরাজ স্বত্বে তদীয় উত্তরাধিকারিগণ অদ্যাপি ভোগ দখল করিতেছেন, ঐ গ্রামের নিকটবর্ত্তী রাধানগর গ্রামে লক্ষ্মী জনার্দ্দনের সেবা স্থাপন করিয়া সীতারাম ঘোষ ৪০ বিঘা জমির লাখরাজ স্বত্ব উক্ত দেবতাকে অর্পণ করিয়া স্বীয় গুরুকে সেবাইত নিযুক্ত করিয়া যান। এখনও উক্ত দেবত্ব লাখরাজ জমির ১১৬৪ সালে ২৫শে ফাল্গুন তারিখে লিখিত একখানি সনন্দ দৃষ্ট হয় এবং সীতারামপুরের তিনটী পুষ্করিণী ঘোষদের পুষ্করিণী বলিয়া বিখ্যাত আছে। এইরূপে হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালে এব সম্প্রতি বৃটিশ শাসনাধীনেও কতক কতক উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ বংশীয়গণ উচ্চ পদাভিষিক্ত ছিলেন ও আছেন, এই কায়স্থ বংশীয়গণ চিরদিনই রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

এই বীরভূমেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ কুলোদ্ভব রাজা গণেশ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ ইতিহাসে বর্ণিত আছে বলিয়াই এস্থানে পুনরুল্লিখিত হইল না।

বাতিকার গ্রামের বিবরণ।

—:০:০:—

আরও অনেক ক্ষুদ্র হিন্দু মুসলমান জমিদার আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও রাজভক্তির বহু কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন ও দয়া দাক্ষিণ্য গুণেও সাধারণতঃ সকলের নিকট প্রশংসিত; কিন্তু দুঃখের কথা, রাজদ্বারে তাঁহাদের গুণের কথা ততদূর প্রকাশ নাই বা রাজা ততদূর সন্ধান রাখেন না। সাধারণতঃ রাজার হিতকর কার্য্যে, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ মধ্যে অনেক এমন বিশুদ্ধ স্বাস্থ্যবান ও কার্য্যক্ষম ও নির্ম্মল চিত্তের বহুলোক পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমান রাজত্ব সময়ে স্বীয় প্রাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রাজার ও প্রজার মঙ্গল কামনায় জীবন শেষ করিয়া

ছেন। অদ্যাপিও প্রাচীন বংশীয় উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ মধ্যে অনেক চরিত্রবান, ন্যায়বান ও রাজহিতৈষী মহাত্মাগণ বর্ত্তমান আছেন ; কিন্তু তাঁহাদের নামগন্ধও রাজসমীপে আসে না, এইরূপ চরিত্রবান লোক অনুসন্ধান করিয়া যদি রাজকর্ম্মচারিগণ রাজা ও প্রজার হিতকল্পে তাঁহাদিগকে নিয়োগ করেন তাহা হইলে অনেকটা রাজা ও প্রজা উভয়েরই মঙ্গল সাধন ও দেশের উন্নতি হওয়া খুব সম্ভব। এই বীরভূম জেলার মধ্যে যে সকল উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ উচ্চ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তদ্বিবরণ অন্যান্য বহু ইতিহাসে ও মৎপ্রণীত এই সামান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসেও উক্ত হইয়াছে।

অত্র জেলার দুবররাজপুর থানার সামীল বাতিকার গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত মদন গোপাল সিংহ নামে এক জন জমিদার আছেন ; ইঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ মধ্যে কেহ কেহ অত্র নগরাধিপতি মুসলমান রাজার দেওয়ান ছিলেন, তাঁহারা তৎকালে নগর রাজাকর্ত্তৃক কতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তাঁহারা নগর রাজের বেবন্দোবস্তি বহু মহালাদির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া রাজপক্ষে যথেষ্ট আয়বৃদ্ধি করিয়া যথাযোগ্য সম্মান সহকারে ঐ সকল সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

অদ্যাপি উক্ত মদন গোপাল সিংহ বর্ত্তমান আছেন। উক্ত মদন বাবু সামান্য জমিদার হইয়াও অত্র জেলায় জজ কোর্টে বহু দিন যাবৎ সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত থাকিয়া সুচারুরূপে স্বীয় পদে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সম্প্রতি পদ ত্যাগ করতঃ গবর্ণমেণ্টের পেন্সন ভোগ করিতেছেন। ইনি বিশেষ বুদ্ধিমান, প্রবীণ ও জমিদারী কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন ; কারণ উক্ত সামান্য জমিদারীর আয় ও অতি সামান্য চাকুরির আয় হইতে স্বীয় জমিদারী পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং অনেক সময় সাধারণের উপকারার্থ অনেক কার্য্য করেন ও রাজপক্ষের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য প্রভৃতিও করিয়া থাকেন। অনেকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন। বয়সাধিক্য হইলেও তিনি বলিষ্ঠকায় আছেন। ইঁহার পুত্র সন্তান নাই, কেবল কন্যাগণের সন্তান সন্ততি আছে। ঐ দৌহিত্র গণকে অবলম্বন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে কালাতিপাত করিতেছেন।

পাঁচড়া গ্রামবাসী জমিদারগণের বিবরণ।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত দুবরাজপুর চৌকীর অধীন পাঁচড়া গ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ জাতীয় প্রাচীন জমিদার বংশধর মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু কমলাকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ত্তমান আছেন। ইনি দয়াবান এবং সাধারণ ও প্রজাবর্গের উপকারার্থে সময় সময় অর্থব্যয় করিয়া থাকেন।

অন্যান্য জমিদার ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সকলের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় নাই; তবে উক্ত পাঁচড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, যিনি পূর্ব্বে হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে রাজপ্রতিনিধিগণ তাঁহার গুণের পরিচয় অবগত হইলেন। সম্প্রতি তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে একবারে হাইকোর্টের জজের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁর পিতার নাম সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বহুদিন যাবৎ সবজজের কার্য্য করেন। প্রসংশিত হাইকোর্টের জজ বাহাদুর নলিনী রঞ্জনের ভ্রাতা জ্ঞানরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় হাইকোর্টের উকীল ও বাবু শরৎ কুমার চট্টোপাধ্যায় অত্র জেলা বীরভূমে জজকোর্টে ওকালতি করেন। যদিও ইহাঁরা ক্ষুদ্র জমিদার তথাপি পাঁচড়া গ্রামে ইহাঁদের যথেষ্ট মান সম্ভ্রম আছে, প্রজাগণও বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করেন।

জেলা বীরভূমের অন্তর্গত সিউড়ি থানার অধীন বীরসিংহপুরের

কালীমাতার ও গোপাল দেবের

সেবাদি বিষয়ে তত্ত্বাবধারকগণের বিবরণ।

জেলা বীরভূম সিউড়ি থানার অন্তর্গত বীরসিংহপুর গ্রামের মধ্যে বীরসিংহপুরের কালী নামে খ্যাত কালীমাতার মন্দির আছে। উক্ত পুরাতন মন্দির জীর্ণ হওয়ায় সেই মন্দির তদবস্থায় বর্ত্তমান আছে। তৎপরে ১২৬১ সালে রূপলাল নামে জনৈক খাজাঞ্চি নূতন ভাবে একটী কালিমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে কালী মাতাকে স্থাপন করেন। তদবধি ঐ মন্দিরে কালিমাতা বিরাজমানা; কিন্তু উক্ত মন্দিরে কালীমাতা কিরূপভাবে আসিলেন, তাহা জনশ্রুতিতে জানা যায় যে হিন্দু

নগরাধিপতি মল্লরাজ বীরসিংহ নগর রাজ্য জয় করিয়া রাজধানী স্থাপন করেন, তিনি শক্তি উপাসক ছিলেন ও বিপুল বলশালী বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাত।

একদা তিনি তাঁহার রাজধানীতে এই কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং রাজা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে মায়ের সেবা পূজায় নিযুক্ত থাকেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস গত হইলে পর, একদিন রজনীযোগে রাজা বীরসিংহের শিরোদেশে ঐ কালীমূর্ত্তি উপস্থিত হইয়া স্বপ্নযোগে আদেশ করিলেন "হে রাজা বীরসিংহ, আমার প্রতি তোমার পূর্ব্বাপর শ্রদ্ধা ভক্তির হ্রাস হইয়াছে কিন্তু তোমার পাটরাণী আমার প্রিয় সেবিকা তাহারই শ্রদ্ধা ভক্তিতে আমি এ যাবৎ অবস্থান করিতেছি, এক্ষণে কালপূর্ণ হইয়াছে, আমি, আমার প্রিয়সখী রাণীর সহিত শীঘ্রই অন্তর্হিত হইব"।

রজনী শেষে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া প্রভাতে চঞ্চল দেহে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাজা রাণীকে জাগ্রত করিয়া তৎসমীপে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। রাণী তাহা শ্রবণ করিয়া ও রাজার ভীতি চাঞ্চল্য দর্শনে বলিলেন "মহারাজ আপনি কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গলময়ী কালিকা দেবীর সেবা অর্চ্চনায় অদ্য হইতে বিশিষ্টরূপে যত্নবান হউন; আমিও আপনার এবং রাজ্যের মঙ্গলের জন্য বিশেষ নিয়মবদ্ধ হইয়া তাঁহার পূজায় ও ধ্যান ধারণায় রত থাকিব"।

তখন রাজা রাণীর প্রবোধ বাক্যে উচ্চবাচ্য না করিয়া মৌনভাব অবলম্বন করিলেন; কিন্তু মনে বুঝিলেন যে মা আমার চঞ্চলা, অবশ্যই যথাকালে রাজধানী ত্যাগ করিবেন।

এইরূপে কিয়দ্দিবস গত হইলে একদা যবন বিপ্লবে মহারাজ বীরসিংহ অসীম সাহসিকতায় বীর যোদ্ধার পরিচয় দিয়া সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করেন; তখনও মহারাণী ৺কালী মাতার আরাধনায় মন্দিরে অবস্থিতা, রাজার যুদ্ধে জয়কামনায় যত বার পুষ্পাঞ্জলি মায়ের পাদপদ্মে অর্পণ করিতেছিলেন ততবারেই উক্ত পুষ্পাঞ্জলি মায়ের পাদপদ্মে পতিত না হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল, তদ্দর্শনে রাণী ভয়বিহ্বলা হইয়া মায়ের দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন মা যেন চঞ্চলভাবে দুলিতেছেন; তদ্দৃষ্টে রাণী ব্যাকুলিতা হইয়া সজল নয়নে স্বামীর মঙ্গলার্থে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; এমন সময় মন্দির দ্বারের নিকটবর্ত্তী অন্দরমহলে জন কোলাহল শ্রুত হইলে রাণী ব্যস্তভাবে বাহির হইবা মাত্র বুঝিলেন তাঁহার বীরপতি সম্মুখ সমরে চিরশায়িত হইয়াছেন, তজ্জন্যই মুসলমানগণ জয়ধ্বনি করিতেছে।

তখন রাণী বিধিবিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, যাহাতে কালী মাতার মূর্ত্তি যবনে স্পর্শ করিতে না পারে এই অভিপ্রায়ে মন্দির মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কালী প্রতিমা ক্রোড়ে ধারণ করতঃ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে প্রতিমা সহ অন্দর মহলের ছাদে উঠিলেন; ইতিমধ্যে যুদ্ধজয়িগণের মধ্যে কতিপয় বীরপুরুষ যবন রাণীর অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া ছাদে উঠিয়া দুর্বৃত্তগণ রাণীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল "হে সুন্দরী তুমি যে প্রকার সৌন্দর্য্য পূর্ণযৌবনা এবং অপরূপ রূপলাবণ্যবতী রমণী, তাহাতে তোমার বিষণ্ণ বদন দর্শনে আমাদের প্রাণ আকুলিত হওয়াতে তোমার পদে আমাদের এই নিবেদন যে আমাদের মধ্যে যাহাকে তোমার অভিপ্রায় হয়, তাহাকে পতিত্বে গ্রহণ করিয়া সংসারসুখে পুনরায় ব্রতী হইয়া এই পূর্ণ যৌবন ও সৌন্দর্য্যের সার্থকতা সম্ভোগ কর, বৃথা গতানুশোচনার প্রয়োজন কি? কালে যে, সকলেরই বিনাশ হইয়া থাকে তাহা তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণী সহজেই বুঝিতে পারিবে, আমরা অধিক আর কি বলিব। সংসারে আসিয়া সংসারের সুখ ভোগই তোমার ন্যায় সুন্দরী ও অল্প বয়স্কা অপূর্ণভোগা রমণীর প্রধান কর্ত্তব্য"।

এই কথা শ্রবণমাত্র রাণী পতিবিহীনা সিংহীর ন্যায় জলদ-গম্ভীর-স্বরে বলিলেন "রে মূঢ় দুর্বৃত্ত, পতি বিরহিনী সিংহী কি কখনও শৃগালের আশ্রয় গ্রহণ করে? হিন্দু সাধ্বী সতী রমণীর কর্ত্তব্য তোমরা যবন হইয়া কি বুঝিবে, স্বচক্ষে দেখ হিন্দু পতি-পরায়ণা বীর রমণীর কর্ত্তব্য কার্য্য কি" এই বলিতে বলিতে মহারাণী অন্দরের দ্বিতলার ছাদ হইতে কালী প্রতিমা মূর্ত্তি বক্ষে ধারণ করতঃ নিম্নে কালিদহে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

জলপ্লাবনে ঐ কালিমূর্ত্তি ক্রমে কুশকুলী দহে অবতীর্ণা হন, তৎপরে উক্ত দহের সহিত মৌরাক্ষি নদীর বর্ষাপ্রভাবে সম্মিলন হওয়ায় উক্ত কালীমূর্ত্তি জনৈক ব্রাহ্মণকে রজনী যোগে স্বপ্নাদেশ দেন যে—আমি এই স্থানে আছি তুমি জাল নিক্ষেপ করতঃ আমাকে উত্তোলন করিয়া রাজনগরে স্থাপিত কর, আমি সেই বীরসিংহের পূজিত কালী।

এমতে উক্ত ব্রাহ্মণ কালীমূর্ত্তি কোন সময়ে উত্তোলন করিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না ও তাঁহার বংশাবলীরও কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

ঐরূপ মন্দিরে কালীমাতার সেবাদির বিশেষ কোন নিয়ম না থাকাতে পূর্ব্ব

মন্দির জীর্ণ হওয়ায় ১২৬১ সালে রূপলাল নামক জনৈক লালা কায়স্থের হৃদয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হওয়ায় মায়ের বর্ত্তমান মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, কিন্তু সে মন্দিরও ভূমিকম্পাদি প্রযুক্ত জীর্ণ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে ; আর কিছুদিন উহার সংস্কার না হইলে ভূমিতে পতিত হইবার সম্ভব ; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ধার্ম্মিকপ্রবর রূপলাল মহোদয়ের বংশধর পৌত্র অত্র বীরভূম জজকোর্টের প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত বাবু লালা মৃত্যুঞ্জয় লাল এবং শ্রীযুক্ত বাবু লালা দিগম্বর মুন্সেফ পদে অভিষিক্ত হইয়াও তাঁহাদের পৈত্রিক কীর্ত্তি যে লোপ পাইতেছে তদ্বিষয়ে আদৌ মনোযোগ দেন না।

ভাণ্ডীরবনের গোপাল বাড়ীর বিবরণ পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে ; কিন্তু উক্ত ভাণ্ডীরবনের প্রধান বিগ্রহ গোপাল দেবের সেবা পূজার তত্ত্বাবধারকগণের বিবরণ সেস্থলে উল্লেখ না করায় এইস্থানে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

এই জেলার অধীন সিউড়ি থানার অন্তর্গত ভাণ্ডীরবন গ্রামের গোপাল মূর্ত্তি ও অন্যান্য বহুল শিলা ও শালগ্রাম মূর্ত্তি এক্ষণে উপস্থিত মন্দিরে স্থাপিত আছেন। উক্ত দেবমন্দির ও পাকমন্দির, নহবতখানা প্রভৃতি ও তৎসমীপস্থ শিবমন্দির এবং জনৈক বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের ক্রোক সাজয়াল *নায়েব বাবুর দ্বারা নির্ম্মিত। উক্ত মন্দির সকল অনেক স্থানে ভগ্ন স্খলিত হইয়াছে ও মন্দিরের বাহির নহবতখানা প্রধান দ্বার, খিরকি দ্বার অনেকাংশে ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত নায়েব কর্ত্তৃক উক্ত দেবের সেবাদির জন্য যে সম্পত্তি অর্পণ করিয়া সেবাইত নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন, সেই আয়ের দ্বারা তৎ সেবাইতগণ ও বংশাবলিগণ ক্রমে এ পর্য্যন্ত সেবাপূজা একজিকিউটারের অধীনে নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। উক্ত দেব সম্পত্তির একজিকিউটার বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বর্ত্তমান সত্বেও তত্ত্বাবধারণের ত্রুটি প্রযুক্তই বোধ হয় উক্ত দেব মন্দিরাদির এরূপ ভগ্ন দশা ঘটিয়াছে। আশা করা যায় যে, কীর্ত্তিমান মহারাজাধিরাজ যখন উক্ত সবার ষ্টেটের একজিকিউটার তখন তিনি এ বিষয়ে কিঞ্চিত কৃপা করিয়া মনোযোগ করিলেই উক্ত দেব মন্দিরাদির যে সংস্কার হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

(প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ)

---

* উক্ত নায়েব বাবুর কোন বংশপরিচয় পাওয়া যায় না ;